চতুর্থ অধ্যায়

বিশ শতকের নব্বই-এর দশকে নির্বাচিত বাংলা উপন্যাসে আখ্যানের বহুমাত্রিক বিস্তার

বাংলা আখ্যানকে নারীচেতনার আলোকে বিশ্লেষণ করতে গেলে সুচিত্রা ভট্টাচার্যের 'দহন' এবং অমলেন্দু চক্রবর্তীর 'রাধিকাসুন্দরী' নারীচেতনার আখ্যানে একটি করে মাইলফলক। আখ্যানের বিচ্ছুরণ বহুমাত্রিক। তার মধ্যে একটি রশ্মি হিসাবে বর্তমান জীবনের অন্যতম লিঙ্গ সমস্যার কথা উল্লেখ করতে পারা যায়। বাংলা আখ্যান নয়, সমগ্র সাহিত্য সমাজ পরিসরে লৈঙ্গিক সমস্যা আজ অন্যান্য অনেক সমস্যার থেকেই গুরুত্বপূর্ণ হয়ে উঠেছে।

> ''পিতৃতন্ত্রের অনুশাসনে শৃঙ্খল ছিঁড়ে বেরিয়ে আসা নারীর স্বকীয় সত্ত্বা-স্বরূপ-ভাষা-ইতিহাস নির্মাণের আপ্রাণ প্রয়াস''।[১]

অতি আধুনিক সাহিত্যতত্ত্বের বিনির্মাণ ঘটে গেছে নারীবাদী বিশ্লেষণের হাত ধরে। ঝিনুক ও রমিতা এবং রাধিকাসুন্দরী সমাজের সম্পূর্ণ ভিন্ন পরিসর থেকে উঠে এলেও এদের জীবনযুদ্ধে বেঁচে থাকার লড়াই কিন্তু ভিন্ন উপায়ে হলেও, বাঁচার লক্ষ কিন্তু এক। পিতৃতন্ত্রের প্রবল আগ্রাসনের বিরুদ্ধে গিয়ে স্বতন্ত্র অস্তিত্ব প্রতিষ্ঠার এক ভীষণ লড়াই এর প্রতিচ্ছবি তাদের জীবন । যেখানে প্রতিনিধিত্ব করছে ঝিনুক, রমিতা আবার রাধিকাসুন্দরী।

আখানের সংজ্ঞা প্রসঙ্গে উল্লেখ্য— ''এক বা একাধিক কথকের দ্বারা এক বা একাধিক আখ্যান গ্রাহকের উদ্দেশ্যে এক বা একাধিক বাস্তব বা কাল্পনিক ঘটনার পুনঃকথন হল আখ্যান।''[২] তবে বলাবাহুল্য, নারীচেতনাবাদী আখ্যানকে হুবহু এই ফ্রেমে বিশ্লেষণ করা বেশ কঠিন। তবে, অসম্ভব নয়। এই ধরনের সংজ্ঞায় দেখা গেছে অতীত ক্রিয়ার প্রাধান্য। সুতরাং নারীবাদী আখ্যানের প্রেক্ষিতে এই সংজ্ঞার বিশ্লেষণের ক্ষেত্রে বলা যেতেই পারে যে, লৈঙ্গিক

অসাম্য সেই সুপ্রাচীনকাল থেকে এর সৃষ্টি মূলত এর সূত্রপাত আর্য পরবর্তী যুগে। কারণ প্রাক্ আর্যযুগে আমাদের সমাজ ছিল মাতৃতান্ত্রিত। আর্যরা আসার পর সমস্ত ব্যবস্থার এক ভয়ানক পরিবর্তন আসে, শুরু হয় পিতৃতন্ত্রের আগ্রাসন। এই আগ্রাসন এই উপনিবেশিকতা থেকে নারী আজও মুক্ত হতে পারেনি। আখ্যানে এই বৈশিষ্ট্যেরই প্রতিফলন ঘটেছে। নারীচেতনাবাদ তাই আর একটিমাত্র সাহিত্যতত্ত্বের মধ্যে সীমাবদ্ধ নেই। এটি Interdisiplinary Approach-র অন্তর্ভুক্ত হয়ে গেছে।

নারীচেতনাবাদী আখ্যানের বিচার বিশ্লেষণের ক্ষেত্রে প্রাসঙ্গিক আখ্যানত্ব এবং আখ্যান মাধ্যম। আখ্যানের একটি অন্যতম বৈশিষ্ট্য হল সংগঠনের দ্বিস্তরিকতা। আখ্যানে মূলত সময়গত সংগঠন দু'ধরনের হয়, (ক) Story time (খ) discourse time যেসময় কাহিনির মূল ঘটনাগুলি ঘটে আর একটা যে সময় আখ্যান পাঠক আখ্যান পাঠ করেন। সুতরাং নারীচেতনাবাদী আখ্যান প্রেক্ষিত বহু প্রাচীন।

বিশ শতকে সাহিত্য সমালোচনায় একটি অন্যতম ধারা হল আখানতত্ত্ব। যদিও সুপ্রাচীনকালে প্লেটো, অ্যারিস্টটল প্রমুখ ব্যক্তিত্বগণ আখ্যানের বিভিন্ন আলোচনা করেছিলেন কিন্তু সাহিত্যের অন্যতম প্রধান শাখা হিসাবে আখ্যানের আত্মপ্রকাশ বিশ শতকে এসেই। তাই আমার গবেষণা সন্দর্ভের স্বল্প পরিসরের কারণে বিশ শতকের নব্বই দশকের নির্বাচিত উপন্যাসের নির্বাচন করা হল।

বর্তমানে সামাজিক পরিসরে নারী অবহেলিত, নিপীড়িত, বঞ্চিত, শোষিত। তবে অবশ্যই নারীবাদ মানে নারীর দুঃখ, নারীর লাঞ্ছনা তার নিপীড়নের তালিকা তৈরি নয়, এই অবস্থা থেকে উত্তরণের উপায়-ই হল 'নারীচেতনাবাদ'। তবে, নারীর অধিকার বিষয়ে শুধুমাত্র নারীরাই সচেতন তা নয়, বেশ কিছু পুরুষও এই আন্দোলনে সোচ্চার হয়েছেন। তবে অবশ্যই অধিক সচেতনতা দরকার নারীর।

দীর্ঘদিন অবহেলা সহ্য করার পর পাল্টা প্রত্যুত্তর দিতে নারী কিছুটা হলেও সক্ষম। তবে বলা বাহুল্য পিতৃতন্ত্রের সূচনা থেকেই হয়ত এই প্রতিবাদ আন্দোলন গঠিত হয়েছিল, তবে তা

কখনো সংগঠিত হতে পারেনি বা তার নির্দিষ্ট কোনো নামে পরিচিতি তৈরি হয়নি। কারণ মানুষের যখন একেবারে দেওয়ালে পিঠ ঠেকে যায় তখন সে সামনের দিক থেকে আসা বিরুদ্ধতাকে ঠেলে সরাবার শেষ প্রয়াসটুকু করে এখান থেকেই হয়ত শুরু হয় 'নারীচেতনাবাদ'। নারী তার প্রতি অত্যাচারের যেমন পাল্টা বিরোধিতা করছে, তেমনি পুরুষ বিবর্তনের মধ্য দিয়ে নারীর প্রতি যুগে যুগে পাল্টে পাল্টে গেছে অত্যাচারের মাত্রা। রামায়ণের যুগে সীতাকে অগ্নিপরীক্ষা দিতে হয়েছিল তাঁর স্বামীর সন্দেহ দূরীকরণের কারণে, আজও মেয়েদের গৃহে, বাইরে পরোক্ষে অগ্নিপরীক্ষা দিয়ে চলতে হচ্ছে।

নারীচেতনাবাদের সূচনা পাশ্চাত্যে ক্রমে এর বিস্তার ঘটে সারা বিশ্বে, কোথাও কম, কোথাও বেশি। শিক্ষাক্ষেত্রে, রাজনৈতিক ক্ষেত্রে, অর্থনৈতিক ক্ষেত্রে নারীকে সমান অধিকারের দাবিতে শুরু হয় নারীচেতনাবাদী আন্দোলন। শুরু হয় মাতৃত্ব রক্ষার দাবিতে বিশেষ কিছু ছুটি এবং সমপরিমাণ বেতন, কর্মক্ষেত্রে পুরুষ ও নারীর সমান বেতনের দাবি। কর্মক্ষেত্রে যৌন হয়রানির দাবিতে আইনি পদক্ষেপ। এমনকী নারীরা পারিবারিক হিংসার ক্ষেত্রেও মুক্তির উপায় জানতে চান। বলা বলাবাহুল্য, এগুলোর বেশকিছু সমাধান হলেও পরোক্ষে নারী আজও অবরুদ্ধ। শিক্ষা, রাজনীতি, অর্থনীতিতে নারী সমান অধিকার পেয়েছে। মাতৃত্বকালীন বিশেষ ছুটি পেয়েছেন। কর্মক্ষেত্রে সমান বেতনভোগী হয়েছেন। কর্মক্ষেত্রে যৌন হেনস্থার বিরুদ্ধে প্রতিবাদ স্বরূপ বিশাখা গাইডলাইনের ব্যবস্থাও করা হয়েছে। কিন্তু নারীর প্রতি পুরুষের অত্যাচারের কৌশল প্রতিদিন পাল্টে পাল্টে গেছে। এমনকী ডিম্বানু সংরক্ষণকে কেন্দ্র করেও পুরুষ নারীর সামনে লোভনীয় টোপ তুলে ধরেছেন।

আগে ছিল সতীদাহপ্রথা এখন হয়েছে গণধর্ষণ, যার জ্বলন্ত দৃষ্টান্ত তুলে ধরেছেন সুচিত্রা ভট্টাচার্য তাঁর 'দহন' উপন্যাসে। 'দহন' উপন্যাসের কেন্দ্রীয় চরিত্র ঝিনুক আর রমিতা। মেট্রো স্টেশনের সামনে সুন্দরী রমিতার সঙ্গে হয়ে যাওয়া শ্লীলতাহানির বিরুদ্ধে সকলে যখন নীরব দর্শক তখন একমাত্র প্রতিবাদে সোচ্চার হয়েছে শ্রবণা সরকার ওরফে ঝিনুক। ঝিনুক অত্যাচারিত না হয়েও রমিতার বিরুদ্ধে আইনি পদক্ষেপ নেওয়ার চেষ্টা করেছিল। কিন্তু

তাতেও ঝিনুককে অজস্র বাধার সম্মুখীন হতে হয়েছিল। এমনকী রমিতার ইচ্ছা থাকা সত্ত্বেও সে তার সঙ্গে হয়ে যাওয়া অত্যাচারের বিরুদ্ধে প্রতিবাদটুকুও করতে পারেনি। রমিতাকে তার স্বামী হয়তো প্রত্যাখ্যান করেননি ঠিকই, কিন্তু তাকে কোনো আইনের সাহায্যও নিতে দেয়নি, কারণ চৌধুরী বংশের মর্যাদা রক্ষার দায়িত্ব সেই বংশের পুত্রবধূর। আর তূনীরের বিদেশ যাওয়ার ক্ষেত্রে শ্লীলতাহানির মতো নোংরা কেস তার Future Carrer-কে নষ্ট করতে পারে তাই সে চায় ঝিনুক যাতে এ সব কেসে না জড়ায়। বলাবাহুল্য এখানে তূনীর ও পলাশ যথাক্রমে ঝিনুকের boyfriend আর রমিতার husband দু'জনেই তাদের হবু স্ত্রী বা স্ত্রীকে ভালোবাসেন কিন্তু নারীর আত্মমর্যাদা রক্ষার ক্ষেত্রে তাদের ভূমিকা নেহাত-ই গৌণ। এরা সকলেই চান শুধুমাত্র আধিপত্য।

কিন্তু মানুষ প্রজাতির ক্ষেত্রে নারী ও পুরুষ উভয়েই সমান। শুধু সমান নয়, একে অপরের পরিপূরক। বিশ্বসংসারে নারী পুরুষ ছাড়া অক্ষম আবার পুরুষ ও নারী ছাড়া অক্ষম। নারী ও পুরুষ উভয় ছাড়া সৃষ্টি থমকে যাবে। তাই সৃষ্টিকে এগিয়ে নিয়ে যেতে নারী ও পুরুষের সহাবস্থান আবশ্যিক। কিন্তু নারী ও পুরুষ একে অপরের পরিপূরক হওয়া সত্ত্বেও সমাজ নারী ও পুরুষকে স্বতন্ত্রভাবে নির্মাণ করেছেন। এখানেই মনে পড়ে যায় সিমন দ্য বোভোয়ার সেই যুগান্তকারী মতটি কেউ নারী হয়ে জন্মায় না, সমাজই তাকে নারী করে তোলে। নারী শারীরিক দিক থেকে যতটা নিজস্ব নির্মাণ তার থেকে অনেক বেশি নির্মাণ সমাজের দ্বারা। তাই বারবার ঝিনুককে শুনতে হয়েছে ''আফটার অল তুমি মেয়ে' কিংবা 'লেখাপড়া শেখানো হয়েছে, চাকরি করতে দেওয়া হয়েছে তাতেই কি তুমি পুরুষ সমাজের সমান হয়ে গেলে নাকি?''[৩] সুতরাং পিতৃতান্ত্রিক সমাজ আর পিতৃতন্ত্রের দ্বারা প্রক্ষালিত নারী মগজ কখনোই নারীকে পুরুষের সমান দেখতে পারেনি। এখানেই ঔপনিবেশিক পুরুষ নারীকে অবরুদ্ধ করে রেখেছে। যে পুরুষ এতদিন ধরে ক্ষমতা ভোগ করে এসেছে তারা ক্ষমতার আস্ফালন করবে এটা স্বাভাবিক। আরো, তারা এই ক্ষমতার হস্তান্তর মোটেই স্বতঃস্ফূর্তভাবে মেনে নেবে না। তেমনি ক্ষমতাহীন থাকতে থাকতে নারীর মজ্জাগত হয়ে গেছে অক্ষমতা, তারা ক্ষমতা পেলেও আজ আর ক্ষমতা ভোগ করতেও পারছেন না।

এভাবেই নারীকেন্দ্রিক উপন্যাসে নারীর সমস্যাপটের বিবর্তন লক্ষণীয়। সুচিত্রা ভট্টাচার্যের 'দহন' উপন্যাসের ঝিনুক, রমিতা এবং মৃণালিনীর চরিত্র বহন করে চলেছেন বিবর্তনীয় লৈঙ্গিক সমস্যাকে। এই প্রত্যেকটি নারী চরিত্রই বিভিন্নভাবে পিতৃতন্ত্রের নিগড়ে বন্দী তার প্রতিফলন 'দহন' উপন্যাস। ঝিনুক অবিবাহিত হলেও এমনকী অনিচ্ছা সত্ত্বেও যে তার boyfriend তূণীরকে কোনোভাবেই প্রত্যাখ্যান করতে পারেনি। রমিতা তো বিবাহিত সমাজ-সংসার-সংস্কারের বেড়াজালে ভীষণভাবে আবদ্ধ আর মৃণালিনী অভিজ্ঞ বটবৃক্ষ। নারী এখানেই পিতৃতন্ত্রের দ্বারা উপনিবেশীকৃত। কিন্তু কেউই তার কাছের পুরুষটিকে অতিক্রম করতে পারেননি। নারী আভিজাত্যের সূক্ষ্মাতিসূক্ষ্ম স্বরের প্রতিফলন ঘটেছে 'দহন' এর বয়ানে।

এখানে রমিতা বা ঝিনুকের মানসিকতা নিয়ে পলাশ বা তূণীর কেউই তেমন চিন্তিত নয়। তূণীর ঝিনুককে ভালোবাসলেও তার বিদেশ যাওয়ার ব্যাপারে পাকাপোক্ত ব্যবস্থা করা নিয়ে অনেক বেশী চিন্তিত। আর পলাশ চৌধুরী তার পরিবারের সোশ্যাল স্ট্যাটাস রক্ষার্থে সদাব্যস্ত।

অভিজ্ঞ মৃণালিনী কিন্তু সংসারে এই অলিখিত বিধি নিয়মগুলি সম্পর্কে জ্ঞাত। তাই ঝিনুকের দুঃখের কথা যেমন তিনি বুঝতে পেরেছিলেন তেমন বুঝেছিলেন রমিতার কষ্টের কথাও। কিন্তু তবুও তিনি ঝিনুককে ভালো থাকতে অনুরোধ করেছিলেন কারণ 'personal is political' সমস্ত ব্যক্তিগত সম্পর্কই রাজনৈতিক। সমস্ত সম্পর্কই একটা স্তরে গিয়ে বিনিময়ের জায়গায় থমকে যায়। সেটা শুধুমাত্র পুরুষ বা নারীর ক্ষেত্রে সীমাবদ্ধ নয়। নারী নারী এমনকী পুরুষ নারী সমস্ত সম্পর্কই রাজনৈতিক। সুতরাং নারী ও পুরুষের মধ্যেযে বিনিময় আসবে এটা খুব স্বাভাবিক। এই ব্যাপক আলোচনা এই স্বল্প পরিসরে অসম্ভব। কিন্তু সেই প্রেক্ষিতে অর্থাৎ লিঙ্গবৈষম্যের ক্ষেত্রে যে কোনো পুরুষ ও নারীর সম্পর্ক বিনিময়ের মধ্যে আবদ্ধ সেটা বাবা-মা, মা-ছেলে, প্রেমিক-প্রেমিকা সর্বস্তরেই হয়। আর সর্বোপরি নারী কখনোই পুরুষের আধিপত্যবাদ থেকে নিজেকে মুক্ত করতে পারেনি, তাই সমালোচকের মতে 'women are last colony'। সুতরাং আমরা যতই স্বাধীন হই না কেন নারী কখনোই

পিতৃতন্ত্র থেকে মুক্ত হতে পারেনি। কারণ অবশেষে তূণীর আর ঝিনুকের মিলন হয়েছে। রমিতাও চৌধুরী পরিবারের পুত্রবধূ হয়ে থেকে গেছে, জয় হয়েছে পুরুষের আগ্রাসনের।

'দহন' উপন্যাসটি আখ্যানতত্ত্বের প্রেক্ষিতে যতটা না বিচার্য তার থেকে অনেক বেশি প্রধান হয়ে উঠেছে নারীচেতনাবাদী প্রেক্ষিতে। এখানে নারীর আত্মসংকটের বাস্তব চিত্র অংকন করেছেন ঔপন্যাসিক। এই আধুনিক আখ্যান হিসাবে 'দহন' উপন্যাস, আখ্যানতত্ত্বকেও অনেকটা সমৃদ্ধ করেছে।

বিশ শতকের একটি অন্যতম সাহিত্যধারা আখ্যানতত্ত্ব। আখ্যানতত্ত্ব সম্পর্কে বলতে গেলে বলতেই হয়, গাছের মূলটা হল 'আখ্যান' আর আমার গবেষণা প্রসঙ্গে প্রাসঙ্গিক উপন্যাস, সেটি হল গাছটির ডাল পালা। গবেষণা সন্দর্ভ আখ্যানতত্ত্বের প্রেক্ষিতে যখন উপন্যাসের আলোচনা সুতরাং সুচিত্রা ভট্টাচার্যের 'দহন' উপন্যাসটি আখ্যান কি তা নয় এটা বিচার এর চেষ্টা করেছি। 'দহন' উপন্যাসে গল্পের একটা সুন্দর নিটোলতা আছে, আছে চরিত্রগুলির অসাধারণ নির্মাণ, চরিত্রের মধ্যে আছে দ্বান্দ্বিকতা। কিন্তু সব কিছু থাকা সত্ত্বেও উপন্যাসে আখ্যান ভাবনা যেন ঠিক তেমনভাবে গড়ে ওঠেনি। তবে উপন্যাসে আখ্যান অনুপস্থিত এটা বলা সম্পূর্ণ ভ্রান্ত। সমস্ত রচনাতেই আখ্যান বর্তমান। আখ্যানের বৈশিষ্ট্য বর্তমান কিনা সেটা সন্দেহের।

সমগ্র 'দহন' উপন্যাস জুড়ে নারীচেতনাবাদী আখ্যানের একটি ব্যাপক বিস্তার লক্ষণীয়। বিশ শতকের ৯০-র দশকে লিঙ্গ সমস্যা সমগ্র বিশ্বে একটি অন্যতম বড়ো সমস্যা 'দহন' উপন্যাসে সমসাময়িক পরিস্থিতিতে এবং নারীচেতনাবাদের সম্মিলিত প্রভাবে 'দহন' হয়ে উঠেছে এক নারীবাদী আখ্যানের দলিল।

> ''সামাজিক ও সাংস্কৃতিক প্রেক্ষিতের সঙ্গে সঙ্গে অভ্যস্ত সংস্কার বা অগ্রাধিকার যেহেতু আমূল বদলে যায়, লেখার ধরণ ও অভিমুখ রূপান্তরিত হয়। বলায়, লেখায় বা কিছু বিজ্ঞাপিত বা দ্যোতিত হয়, তাতে ছোট্ট বীজের মধ্যে প্রচ্ছন মহীরূহের সম্ভাবনার মতো, লুকিয়ে থাকে আখ্যান বীজ। এই বীজ সম্বোধকের প্রকাশ ক্ষমতা ও সম্বোধিতের গ্রহণ সামর্থ্যের ভিত্তিতে

অঙ্কুরিত হয়ে ক্রমশ সম্প্রসারণের মধ্যে দিয়ে বনস্পতির সংরূপ ও চরিত্র অর্জন করে নেয়।"[৪]

এভাবেই দহনের মধ্যে প্রচ্ছন্ন মহীরূহের সম্ভাবনার মতো লুকিয়ে থাকে নারীবাদী আখ্যান। ঔপন্যাসিক সময়কে কখনোই অস্বীকার করতে পারবেন না। তাই বর্তমান বিশ্বে নারীচেতনাবাদী আখ্যানের ব্যাপক বিস্তার ঘটেছে এটা খুব স্বাভাবিক, বর্তমান সময়কে ধরে রাখার ক্ষেত্রে নারীর জীবনকে কেন্দ্র করে যে অসম্ভব আর্তি উঠে এসেছে তাকে হয়ত নারীবাদী আখ্যান বললে ভুল হবে না।

তবে, সুচিত্রা ভট্টাচার্যকে সম্পূর্ণ নারীবাদী বললে ভুল হবে তবে voiceless Section of the Indian Society র প্রধান ধারক যে নারী। সেই নারীজীবনের অসংখ্য দুঃখ বেদনার কথা তিনি উপলব্ধি করেছেন। নারীকে ভিন্ন শ্রেণি বা বিভিন্ন জীবনের বাঁকে দাঁড় করিয়েও নারী শেষিত শ্রেণির প্রতিনিধিত্ব করে চলেছেন। তাই, সুচিত্রা দেবী সংসার অভিজ্ঞতায়পূর্ণ প্রবীণ মৃণালিনী সমাজ সংসারে কঠোর নিয়মে বন্দী রমিতা আর অবিবাহিতা শিক্ষিত ঝিনুক এদের সকলের দ্বারা নারী জাতির ভিন্ন শ্রেণির প্রতিনিধিত্ব করালেও এরা কিন্তু সেই চিরকাল-ই সমাজ সংসারে বঞ্চিতা।

'নারীকে আপন ভাগ্য জয় করিবার' অধিকার কেন যে বিধাতা দেন নি? তার সঠিক উত্তর আজও পাওয়া যায়নি। তবে, সম্ভাব্য কিছু ধারণা তৈরি করলেও নারী আপন ক্ষমতা বলে বলীয়ান হবার কৌশল রপ্ত করতে এখনো অক্ষম। তবে, পুরুষ কখনোই স্বেচ্ছায় তাদের অধিকার ছেড়ে না দিলেও, নারীর অধিকার সম্বন্ধে সূচনা অল্প পুরুষ মানুষের দ্বারাই সাধিত হয়েছে। বর্তমানে নারী সে কাজের দায়িত্ব নিজের কাঁধে তুলে নেওয়ার চেষ্টা করলেও সম্পূর্ণ সক্ষম হয়নি।

নারীবাদী আখ্যানতত্ত্ব আলোচনা প্রসঙ্গে বলাবাহুল্য , আখ্যানতত্ত্ব শুধুমাত্র লিখিত আখ্যানের আলোচনায় সীমাবদ্ধ থাকেনি। আখ্যানতত্ত্ব নির্মিত হয়েছে মূলত সংগঠনবাদী আলোচনার সূত্রে। আখ্যানতত্ত্বের পাঠ মূলত আন্তঃবিষয়ক এবং বহুবিষয়ক। নানা সাহিত্যিক, সাহিত্য নয় এমন বিষয় এছাড়া বিভিন্ন বয়ানের আখ্যানতত্ত্ব সম্পর্কে আলোচনা এবং আখ্যান

যে হয়ে ওঠেনি তার আলোচনা আখ্যানতত্ত্বের অর্ন্তভুক্ত হয়ে পড়েছে। সিনেমা, থিয়েটার, নাটক, কাব্য, গল্প, বিজ্ঞাপন, ইতিহাস সাধারণভাবে এগুলির মধ্যে আখ্যান দৃষ্ট হয় না কিন্তু বলাবাহুল্য, সব বিষয়ের মধ্যে আখ্যান ভীষণভাবে বর্তমান।

> ''বিভিন্ন বিষয়ে আলোচনার সূত্রে এবং অভীষ্টের ভিন্নতার জন্য আখ্যানতত্ত্ব সংক্রান্ত নানা জটিল তত্ত্ব নির্মিত হয়েছে। যেমন নারীবাদী আখ্যানতত্ত্ব (Feminist Narratology) স্বাভাবিক আখ্যানতত্ত্ব (Natural Narratology) সমাজ আখ্যানতত্ত্ব (Social Narratolgy) মনো আখ্যানতত্ত্ব (Psycho Narratology) ইত্যাদি। এইভাবে আখ্যানতত্ত্ব তত্ত্ববিশ্বের বিস্তীর্ণ পরিসরে পরিকীর্ণ হয়েছে। এইভাবে 'Structuralist or classical narratology evolved into post classical narrtology''।[৫]

সুতরাং সুচিত্রা ভট্টাচার্যের 'দহন' উপন্যাসে যে নারীবাদী আখ্যানের ব্যাপক বিস্তার আছে তা লক্ষণীয়। আখ্যানের অন্যতম বৈশিষ্ট্য হল আখ্যান বিভিন্ন মাধ্যমে থাকতে পারে। এগুলির মধ্যে মৌখিক ও লিখিত মাধ্যম অন্যতম, লিখিত মাধ্যম গদ্য ও পদ্য উভয়েই হতে পারে। সুচিত্রা ভট্টাচার্যের 'দহন' উপন্যাস গদ্যে লিখিত নারীবাদী আখ্যান।

উপন্যাসের মূল নির্যাস থুড়ি আখ্যান হিসাবে চিহ্নিত করা যায় তা হল দীর্ঘকাল ধরে অবহেলিত বঞ্চিত, শোষিত, নিপীড়িত নারীদের কথা। কিন্তু একবিংশ শতাব্দীতে এসেও নারী আজও পিতৃতন্ত্র থেকে মুক্ত হতে পারেনি, তবে পাল্টা প্রতিরোধ গড়ে তুলতে সক্ষম হয়েছে, শেষরক্ষা যদিও হয়নি, তবে নারী প্রতিবাদে সোচ্চার হয়েছেন।

নারী পুরুষ কেউই পরস্পরের প্রতিদ্বন্দ্বী নয়, উভয়েই উভয়ের পরিপূরক। নারী ও পুরুষের সহাবস্থান ছাড়া সমাজের সকল সৃষ্টি-ই থেমে যাবে। তাই হাজার প্রতিবন্ধকতা সত্ত্বেও নারী ও পুরুষের উভয়েই উভয়ের পরিপূরক। নারী ও পুরুষের সহাবস্থান ছাড়া সমাজের সকল সৃষ্টি-ই থেমে যাবে। তাই হাজার প্রতিবন্ধকতা সত্ত্বেও নারী ও পুরুষের উভয় উভয়ের প্রতি সাহচর্য একান্ত কাম্য। স্ত্রী এবং পুরুষ ভিন্ন প্রজাতিভুক্ত হলেও এরা উভয়েই মানব জাতি, সুতরাং

মানবতার ধর্মে নারী পুরুষ সকলেই সমান। কিন্তু এটাই বিস্ময়ের নারীর স্বাতন্ত্র্য, ব্যক্তিত্ব মনুষ্যত্ব কিছুই সমাজে স্থিত হয়নি। নারীকে সমাজে প্রতিষ্ঠিত দেখতে চাওয়া মানেই নারীর সত্তাকে পুরুষের পরিপূরক সত্তা হিসাবে কল্পনা করা অর্থাৎ কন্যা জায়া জননী ছাড়া নারীর কোনো ব্যক্তি স্বাতন্ত্র্য থাকতে পারে না। অথচ পূর্বেই আলোচিত হয়েছে নারী মানুষ। স্বতন্ত্র সত্তা বিশিষ্ট এক মানুষ। অথচ সমাজ পুরোপুরি তার অস্তিত্বকে অস্বীকার করে পুরুষ তার পরিপূরক চরিত্র হিসাবে নারীর নির্মাণ করে চলেছেন। সামগ্রিকভাবে নারীসত্তার অধিকার প্রতিষ্ঠার চেষ্টা হল নারীচেতনাবাদ।

'দহন' উপন্যাসে ঝিনুক তাদের এই চেতনা সমন্বিত ভাবনাকে বাস্তবায়িত করার আপ্রাণ চেষ্টা করলেও সমাজ নারীকে কোনোভাবেই এগিয়ে আসতে সাহায্য করেনি। কারণ তাকে পশ্চাতে টেনেছে। তার জ্বলন্ত উদাহরণ রমিতা চৌধুরী। আর এই সমস্ত কিছু জানা সত্ত্বেও চুপচাপ অভিজ্ঞতার ভাবে জর্জরিত মৃণালিনী।

এতদিন ধরে ক্ষমতা ভোগ করতে করতে যারা অভ্যস্ত হয়ে পড়েছে। তারা এত সহজে ক্ষমতার হস্তান্তর মেনে নিতে পারে না। আর আজ সেজন্যই নারীর অধিকার নারীর দাবি, সবটাই নারীর ওপর দায়ভার অনেক বেশি।

উপনিবেশোত্তর যুগে এসে বোধহয় আমরা উপন্যাস প্রকরণটির সঙ্গে ভীষণ পরিচিত হয়ে পড়েছি কিন্তু পূর্বে আমাদের নিজজ্ব প্রকরণ -ই ছিল আখ্যান। এই উপনিবেশোত্তর প্রেক্ষিতে আবার নারীচেতনাবাদকে নিয়ে লেখা উপন্যাস সবটাই পাশ্চাত্যে বা উপনিবেশবাদকেই প্রাধান্য দিয়ে থাকে। তবে, বলাবাহুল্য, 'দহন' উপন্যাসে, উপন্যাস, আখ্যানের থেকেও প্রাধান্য পেয়েছে নারীচেতনাবাদী দলিলীকরণ,

''যে দুঃসময়ে সময়ের গ্রন্থি ভেঙে যায়, তখনই ঔপন্যাসিকের উপন্যাস লেখার সুসময়''।[৬] এই উপন্যাসের মধ্যে যে সত্য প্রধান হয়ে উঠে আসে তাই হল উপন্যাসের আখ্যান অর্থাৎ নারীর পাওয়া এবং না পাওয়ার মধ্যে যে দ্বন্দ্ব প্রধান হয়ে উঠেছে 'দহন' উপন্যাসে এটাই খানিকটা আখ্যান রূপে নির্মিত হয়েছে।

নারীর প্রতি যত অবিচার অত্যাচার হয়েছে তার প্রতিরোধ আন্দোলন ও তেমনভাবেই

হয়েছে। যতই মনে করা হোক না কেন শুধুই অত্যাচার হয়েছে তা কিন্তু নয়, অত্যাচারের বহুমাত্রিকতার সাথে সাথে প্রতিরোধ ঘটেছে খুব সামান্যভাবে। কিন্তু এর মাঝের যন্ত্রণাদগ্ধ জীবনের ইতিহাস কিন্তু পিতৃতন্ত্রে জানা নয়, জানার কথাও নয়। আবার নারীই ভাবে তার সমস্ত শক্তি গৃহ চৌহদ্দির মধ্যে যথেষ্ট শক্তিশালী। কিন্তু এই শক্তিবৃদ্ধির পিছনেও পুরুষের হাত। নারী এটাও বুঝতে অক্ষম এই মিথ্যা প্রতিপত্তিও পুরুষ প্রদত্ত। কারণ পুরুষ জানে এই ক্ষমতার আড়ালে নারীর ওপরই আরোপ করা হয় সমস্ত দায়িত্বের বোঝা। সুচিত্রা ভট্টাচার্য হয়ত এই বিষয়টা ভীষণভাবে উপলব্ধি করেছিলেন, তাঁর 'হেমন্তের পাখি' উপন্যাসেও এই ঘটনার পুনরাবৃত্তি চোখে পড়ে। সমাজের সকল নীতি-নিয়ম, অবশ্য পালনীয় কর্তব্য হিসাবে সমস্ত দায়িত্ব যখন নারীর তখন বিপথগামী পুরুষকে সঠিক পথে ফিরিয়ে আনাও নারীর দায়িত্ব। পরোক্ষে তাদের বক্তব্য পুরুষের বিপথগামীর পিছনেও নাকি নারীর ই হাত থাকে। তাই কৌশলে নিজের দায়িত্ব এড়াতেই পুরুষের এই প্রক্রিয়া। আর নারীকে বাঁধা হয় সতীত্ব, বংশমর্যাদা, জননী ইত্যাদির নিগড়ে। কিন্তু পুরুষকে পরিমাপের জন্য এ ধরনের কোনো মাপকাটি তৈরি হয়নি।

তবে, বলাবাহুল্য, নারীবাদ মানে সম্পূর্ণ রূপে পুরুষ বিদ্বেষী তা কিন্তু নয়। নারীবাদ মানে নারীর অস্তিত্ব নারীর অধিকার দাবি বিষয়ে, সচেতন করে তোলার প্রয়াস। শিক্ষা রাজনীতি-অর্থনীতির ক্ষেত্রে নারী খানিকটা স্বাধীনতা পেলেও প্রকৃত অর্থে নারী স্বাধীন হয়নি। সমাজের বিভিন্ন ক্ষেত্রে নারী পুরুষের বৈষম্য দূর হলেও, সামাজিক নির্মাণের ক্ষেত্রে নারী পুরুষ ভীষণভাবে ভিন্ন। সময়ের সঙ্গে সঙ্গে পাল্টাতে থাকে পিতৃতন্ত্রের কদর্য চেহারা। বা পুরুষতন্ত্র দ্বারা প্রমাণিত নারী মগজে ধরাই পড়ে না। নারীবাদের মূল বিষয় হল ঠিক এই জায়গাগুলি তুলে ধরা। অর্থাৎ নারীর জীবনচর্যার ক্ষেত্রে অর্থাৎ পুরুষতন্ত্রের মধ্যে থেকে নারীর জীবনচর্যার সাম্যবাদী ধারণা প্রতিষ্ঠাই নারীচেতনাবাদের মূল লক্ষ। সুচিত্রা ভট্টাচার্য একজন নারী তার লেখায় নারীর জীবন যেমনভাবে প্রতিবিম্বিত হয়েছে কোনো পুরুষের লেখনিতে কিন্তু তা হয়নি। কারণ পুরুষের 'চোখে নারী যেমন, নারীর নিজস্ব লেখনিতে নারী কিন্তু তেমন নয়।

সাহিত্য জগতে মেয়েদের আর্বিভাব উনিশ শতকে ঘটলেও একবিংশ শতাব্দীতে এর ব্যাপক বিস্তৃতি লক্ষণীয়। তবে উনিশ শতকে রাসসুন্দরী দেবী, স্বর্ণকুমারী দেবী, নিরুপমা দেবীর জীবনে সংসারে সমস্যা যেভাবে ঘনীভূত হয়েছিল বর্তমানে সামাজিক প্রেক্ষাপট পরিবর্তনের সাথে সাথে নারীর যুগসমস্যা একেবারে পাল্টে পাল্টে গেছে। সামাজিক নির্মাণ অনুযায়ী নারীর চরিত্রের যদি পরিবর্তন ঘটে বা পুরুষ নির্দিষ্ট নিয়মের বাইরে চলে যায় তখন সকলেই নারীর প্রতি বক্র চোখে তাকাতে থাকে। সুচিত্রা ভট্টাচার্যের 'দহন' উপন্যাস নাগরিকতার আবহে নারীসত্তার বিভিন্ন সংকটের কথা তুলে ধরেছেন যেখানে যুগচিহ্ন ভীষণভাবে বর্তমান। এই উপন্যাসে আখ্যান নিশ্চয়ই আছে কিন্তু এটা শুধুমাত্র আখ্যানের পরিবর্তে অনেক বেশি নারীবাদী আখ্যান হয়ে উঠেছে। তাই 'দহন' উপন্যাসের মধ্যে দিয়ে সমগ্র নারী জাতির সংকটের কথাই প্রধান হয়ে উঠেছে।

মনুষ্যত্বের জেরেই নারী ও পুরুষ সমান ক্ষমতাশালী Biological দিক থেকে মানুষ হিসাবে নারী ও পুরুষ ভিন্ন দেহের অধিকারী হলেও তারা মানুষ কিন্তু এই মানব নির্মাণের ক্ষেত্রে সমাজ বারংবার নারীকে পিছিয়ে দিয়েছে।

শিক্ষা রুচি সমাজ পরিবর্তনের সঙ্গে সঙ্গে ঘরে বাইরে মেয়েদের সমস্যাপটের পরিবর্তন ঘটেছে। সুচিত্রা ভট্টাচার্যের 'দহন' তারই এক দলিল ঝিনুক, রমিতা, মৃণালিনী এই তিন নারী চরিত্রের মধ্যে দিয়ে বর্তমান কালের জীবনচর্যা যেভাবে পালন করেছেন তারই বিস্তৃত বিবরণ 'দহন'।

নারীসত্তার নানা বিভঙ্গ এবং সংকটের মূলে আছে সমাজ ও পরিবার। কারণ পুরুষ ও নারী যতটা biologically different তার থেকে অনেক বেশি different সামাজিক প্রেক্ষিতে। পুরুষ ও নারীর প্রতি সমাজের যে অচল ও অনড় বিভাজন তাও এই উপন্যাসে স্পষ্ট। যদিও নারী বর্তমানে অন্দর মহলের অধীশ্বরী নন। তাঁর ক্ষমতা গৃহে বাইরে সর্বত্র সমান। তবুও নারী আজও শুধুমাত্র পুরুষের ভোগ্য পণ্য।

টালিগঞ্জ মেট্রো স্টেশনের সামনে স্বামী নামক পুরুষ পাহারাদার থাকা সত্ত্বেও সুন্দরী ঝকঝকে রমিতা বেশ কিছু যুবকের দ্বারা 'মলেস্টেড' হন। এই ঘটনার প্রতিবাদে রমিতা বা

তার স্বামী পলাশের পরিবর্তে এগিয়ে আসে ঝিনুক। ঝিনুক সমস্ত আইনী পদক্ষেপ নেয়। কিন্তু তার পরেও এই সত্যের প্রতিবাদের স্বরূপ তার কপালে জোটে অসংখ্য প্রতিবন্ধকতা। এমনকী তার boyfriend তূণীর-ও সরাসরি ঝিনুকের এই ঘটনার প্রতিবাদ করে। যা ঝিনুক স্বপ্নেও কল্পনা করতে পারেনি। অবশেষে চৌধুরী পরিবারের বউ রমিতা তাঁর স্বামী পলাশ এমনকী তূণীরের কাছেও ঝিনুক পুরোপুরি হেরে যান। হাজার চেষ্টা করেও ঝিনুক শেষ রক্ষা করতে পারেনি। কারণ সে একটা মেয়ে এবং সে অপর একটি মেয়ের সম্মান রক্ষার চেষ্টা করেছে। সামাজিক নির্মাণের দ্বারা নারী মানুষ নর ঊন মানব বা অসম্পূর্ণ পুরুষ তাই তাদের সম্মান, স্বতন্ত্রসত্তা কিছুই নেই। এই সমস্ত প্রতিবন্ধকতার ফলে ঝিনুকের মধ্যে সৃষ্টি হয় যে ব্যক্তিগত সংকট তার মধ্যে দিয়ে স্পষ্ট বর্তমানে সুন্দরী, শিক্ষিতা স্মার্ট, নারীও বিভিন্নভাবে পুরুষতন্ত্রের নিগড়ে বন্দী। নারী শিক্ষিত হোক, সুন্দরী হোক, রাজনৈতিক হোক সবটাই পুরুষের নিমিত্তার্থে। নারী শুধুমাত্র পুরুষের ভোগের সামগ্রী নারীর কাছে অন্দরমহলের দখলদারিত্ব যেন দাস্যতারই প্রতীক। আর এই দাসীবৃত্তির অপর ছবি হল 'দহন' উপন্যাস। প্রত্যক্ষভাবে এই দাসখতে নাম লিখিয়েছে রমিতা ও ঝিনুক।

সমাজ বাস্তবতার দিকটিকে ঔপন্যাসিক উপন্যাসের মাধ্যমে তুলে ধরেছেন। সমাজ বাস্তবের এই কঠিন দিকটিই হল 'আখ্যান' বলা ভালো নারীবাদী আখ্যান এ প্রসঙ্গে উল্লেখ্য,

> ''একজন লেখক ঔপন্যাসিক বিবরণ লেখার মধ্যে ঢুকে পড়তে পারেন নিজে না জেনেই। তিনি আসলে তখন বহু মানুষের এমন বহুস্বর খুঁজে বেড়ান যে বহুস্বরের মধ্যে তাঁর নিজের স্বরটাও মিশে যায়। বিবরণকার কোনো জায়গায় তারই কথা বলে প্রায় কোনো কথা বলেন না অথচ বিবরণকারের নিজের স্বর ছাড়া অন্য সব স্বরই সেখানে অর্থহীন। অন্য বহুস্বর ছাড়া তাঁর সেই নির্দিষ্ট স্বরটা চিনে নেওয়া যায় না, কিন্তু লেখকের নিজস্ব স্বর ছাড়াই স্বর সেই অন্য স্বরগুলি হয়ে যায় অপ্রাসঙ্গিক। এই যে বহুস্বর আর লেখকের স্বরের দ্বৈততা তা থেকেই তৈরি হয় উপন্যাসের আততি।''[৭] আর এর মূলটাই হল আখ্যান।

সমস্ত বাধা প্রতিবন্ধকতা সত্ত্বেও নর-নারীর ভালোবাসা বা প্রেমের সম্পর্কের যে জটিল দ্বান্দ্বিকতা তা খুব জটিল। কারণ ফ্রয়েডীর ভাবনায় এর ব্যাপক গভীরতা ঔপন্যাসিক এ ব্যাপারেও খানিকটা ইঙ্গিত দিয়েছেন ঝিনুক ও তূণীরের সম্পর্কের মধ্যে। তবে এত স্বল্প পরিসরে এত বিস্তৃত ব্যাপক আলোচনা অসম্ভব তাই নির্বাচিত প্রেক্ষিতে আলোচনা চালানোর চেষ্টা করা হল। বর্তমান গতিশীল জীবনে সম্পর্কগুলো ভীষণ মূল্যহীন হয়ে পড়ে। অর্থ যশ খ্যাতি প্রতিপত্তি-র লোভে মানুষের কাছে সম্পর্ক আজ মূল্যহীন। অর্থ খ্যাতির কারণে মানুষ সবকিছু ত্যাগ করতে পারে কিন্তু সবকিছুর জন্য মানুষ যশ খ্যাতি, প্রতিপত্তি ছাড়তে পারে না। এটা মানুষ তাৎক্ষণিক বুঝতে না পারলেও যখন বোঝে তখন আর কিছু করার থাকে না। এভাবেই বর্তমান জীবন ক্রমশ জটিল হয়ে পড়ে।

নারীর মান সম্মান, এমনকী অপমান ও পুরুষ নির্ধারণ করেন তার নিজস্ব দৃষ্টিভঙ্গিতে। নারী যে তার স্বতন্ত্র ব্যক্তির দৃষ্টিভঙ্গিতে নিজস্ব মানদণ্ড তৈরি করতে পারে পুরুষ তা মেনে নিতেই চান না। এখানেও ঝিনুক ও তূণীরের কথা বিশেষভাবে প্রাসঙ্গিক। তাই তূণীর খুব সহজেই এই নোংরা কেস থেকে ঝিনুক সরিয়ে নিতে বলেছে। কারণ এর সাথে তূণীরের বিদেশ যাওয়ার ব্যাপার জড়িত। নারীর আত্মসম্মান তার কাছে ভীষণ বেশিরকম অর্থহীন। স্ত্রী-র শ্লীলতাহানির ব্যাপারে পলাশ চৌধুরী ভীষণ Social Status বা Prestige সচেতনতা স্ত্রীর ব্যাপারে নয়, সচেতনতা concious রক্ষার্থে এই সমস্ত কিছুই মধ্যযুগীয় সামন্ততান্ত্রিক মানসিকতার পরিচয় বহন করে চলেছে। বউ-কে সমাজে পরিচিত করার জন্য তার সমান যোগ্যতা সম্পন্ন সুন্দরী বউ-এর দরকার। কিন্তু স্ত্রী বা প্রেমিকা তার যোগ্যতার বহিঃপ্রকাশ যেটুকু করবে তা স্বামীর মাপকাঠিতে।

যতই বলা হোক না কেন নারী আজ স্বাধীন কিন্তু নারীর এই স্বাধীনতা সবটাই পুরুষের নির্ধারণের নিরিখে। এর জ্বলন্ত উদাহরণ 'দহন' উপন্যাসের চরিত্র রমিতা। উচ্চবিত্ত পরিবারের গৃহবধূ রমিতা। তার স্বামী যথেষ্ট রোজগেরে ইঞ্জিনিয়ার বেশ ক এক মাসের মধ্যেই রমিতা পলাশের পরিবারের সকলের ঘনিষ্ঠ হয়ে উঠেছে। পলাশের পরিবারের সকল মানুষ সম্পর্কে রমিতা সচেতন, পলাশ কিন্তু মোটেও রমিতা সম্পর্কে এতটা সচেতন নয়। বা রমিতার পরিবারের

সাথে পলাশের ঘনিষ্টতার কোনো বিশেষ কথাই পাই না। পলাশের পরিবারের মান সম্মান সোশ্যাল স্টেটাস বজায়রাখার সমস্ত দায়িত্ব-ই যেন রমিতার। তাই তার নিজের প্রতি হয়ে যাওয়া অন্যায়ের প্রতিবাদ ও সে করতে পারে না। কেউ তার সাথে হয়ে যাওয়া অন্যায়ের প্রতিবাদ করলেও তাকে সমর্থন করার কোনো অধিকার ও তার নেই। তা নাকি চৌধুরী পরিবারের মান সম্মান ক্ষুণ্ণ হবে। এমনকী বড়োবাড়ির বউ বলে সে তার পছন্দের পোশাকটিও পরতে পারবে না, রাস্তার ধারে দাঁড়িয়ে ভেলপুরী খেলেও তার Social Status নষ্ট হবে। সুতরাং বিবাহিত বলে তার সমস্ত ব্যক্তিস্বাতন্ত্র্য লোপ পেয়েছে। তার নিজস্ব ইচ্ছা অনিচ্ছা বলে কিছুই নেই। সবটাই পলাশ এবং তার পরিবারের ইচ্ছার ওপরই নির্ভর করতে হয়। বলাবাহুল্য রমিতা এখানে নিজের Safety and sceurity র কারণে হয়ত চৌধুরী পরিবারের বউ হতে রাজী হয়েছিল কিন্তু সেটুকুও সে পায়নি। তবুও তার এই নীরবতা সমগ্র নারী জাতিকে আধিপত্যবাদী পুরুষের কারাগার বন্দী করেছে। মানুষ আধুনিক হলেও তার ব্যক্তিস্বাতন্ত্র্যের কোনো পরিচয়ই পায়নি।

স্মার্ট, ঝকঝকে, শিক্ষিতা তরুণী শ্রবণা সরকার ওরফে ঝিনুক যখন নিজে জীবন বিপন্ন করেও রমিতাকে উদ্ধার করে তার সাথে হওয়া অন্যায়ের বিরুদ্ধে প্রতিবাদ করে তাতে পলাশের পরিবার কৃতজ্ঞতার বদলে অত্যন্ত বিরক্ত, সংসার অভিজ্ঞ বুদ্ধিমতী মৃণালিনী আগে থেকেই এই ঘটনার আঁচ পেয়ে ঝিনুককে সাবধান করেন এবং ঝিনুকের মানসিক শ্রূশ্রুষা করেন। কিন্তু মাঝখান থেকে ক্ষতবিক্ষত হতে থাকে রমিতা। পুরুষতান্ত্রিক সমাজ এমনভাবে নির্মিত যে শ্লীলতাহানির মতো খারাপ, কষ্টকর, ঘটনা ঘটার পর ও মেয়েটিকে খুঁটিয়ে খুঁটিয়ে দেখতে কিন্তু পরিবারের কোনো সদস্যই পিছ পা হয়নি। এত যে victim আরো অস্বস্তিতে পড়বে তার কথা অপর একটি নারীও ভাবে না। কারণ সেইসব নারী ও পুরুষতন্ত্রের ছাঁচে ছালা। রমিতার শাশুড়ি এর মধ্যে অন্যতম। আজ রমিতা চায় মানসিক ও শারীরিক আশ্রয়। কিন্তু তার শ্বশুরবাড়ির লোক তো দূরের কথা তাঁর জীবনসঙ্গীটিও রমিতা এবং ঝিনুকের প্রতি অধৈর্য্য। আর প্রত্যেকটি সম্পর্ক মোটামুটি বিনিময়ের ওপর দাঁড়িয়ে, তাই রমিতাও আর জোর করে শ্বশুরবাড়ি থেকে বেরিয়ে যেতে পারছে না। কারণ বিবাহের পর মেয়েদের আশ্রয়স্থল তার

শ্বশুরবাড়ি। আর বিবাহিত মেয়ে বাপের বাড়িতে গিয়ে আর থাকতে পারে না। এই অলিখিত কতগুলো নিয়মের বেড়াজালে রমিতার জীবন পিষ্ট হতে থাকে। চৌধুরী পরিবারের সুনাম রক্ষার্থে সে identification এও যেতে পারবে না। কারণ এটাই তার পরিবারের ইচ্ছা, এভাবে এখনো পুরুষের দ্বারা নির্ধারিত হতে থাকে নারীর জীবন। একটি উচ্চবিত্ত তথাকথিত উচ্চবিত্ত পরিবার শিক্ষায় পোশাকে-আশাকে যুগরুচিতে আধুনিক হলেও তার সামাজিক মূল্যবোধ এখনও পাল্টায়নি। ঐতিহ্যকে অস্বীকার করে ব্যক্তিস্বাতন্ত্র্যকে মেনে নিতে পারে নি, পুরুষ নিজের স্বার্থে। পলাশ সেজন্য খুব সহজেই বলতে পেরেছে—

> ''তোমার কি? তুমি বাড়িতে শুয়ে শুয়ে কেঁদে কেঁদেই খালাস। কথা তো শুনতে হচ্ছে আমাকেই বাড়ি, আত্মীয় স্বজনদের কথা বাদই দাও, হোয়াট অ্যাবাউট মাই অফিস? বন্ধুবান্ধব প্রত্যেকে সিমপ্যাথিতে চুকচুক করছে। অ্যান্ড আসকিং ডাটি কোয়েশ্চেনস্।''[৮]

পলাশ কখনোই ভাবার চেষ্টাই করে না এই সমস্ত ঘটনার প্রেক্ষিতে রমিতার মনের অবস্থাটাও কতটা খারাপ হতে পারে। এই সময় স্বামী হিসেবে পাশে থাকা মানসিক শ্রূশ্রুষার কথা পলাশ ভাবেইনি অথচ সে আধুনিক শিক্ষায় ভাবনায় চিন্তিত। এক্ষেত্রে পলাশ মানবতাকেও লঙ্ঘন করেছে। সেখানে সে শুধুমাত্র তার পরিবারের প্রতি কর্তব্য পালনেই ব্যস্ত। কিন্তু বিবাহ পরবর্তী জীবনে একেবারে অন্য একটি মেয়ে যখন তার স্বামীর পরিবারকে আপন করে নিতে পারছে তখন স্বামীর উচিত স্ত্রীর সমস্ত সুখে দুঃখে পাশে থাকা, এটা বিনিময় হলেও বিনিময়ের মাধ্যমে সম্পর্কের ভীত দৃঢ় করা।

বলাবাহুল্য পুরুষ মানুষ হওয়া সত্ত্বেও অপর মানুষটির চিন্তা-ভাবনা দুঃখ কষ্ট সর্বোপরি আবেগকে কোনোদিন কোনো মূল্য দিতেই চায়নি। রমিতার শ্বশুরবাড়ি তথা বাড়িরলোকের মনে রমিতাকে নিয়েই অনেক সংশয় জেগেছে। রমিতা ছেলেগুলোকে কোনোভাবে উত্তেজিত করেছিল কিনা কিংবা পূর্বপ্রেম সম্পর্কে কথা বলতেও কেউ ছাড়েনি। রমিতার শাশুড়ি নারী হওয়া সত্ত্বেও সে একটা মেয়ের দুঃখ কষ্ট, যন্ত্রণার ব্যাপারে বোঝার চেষ্টাও করেনি। উল্টে বলেছে, ''মেয়ে মানুষের গায়ে একটা দাগ পড়লেই মৃত্যু পর্যন্ত সে খুঁতো হয়ে যায়।''[৯] মেয়ে

মানুষের কষ্টটা আগে নয়, তার কলঙ্কটাকেই প্রাধান্য দেয় সমাজ। এমনকী ঝিনুক যখন রমিতার পাশে দাঁড়াল তখনও তাকে অনেক প্রতিবন্ধকতার সম্মুখীন হতেও হয়েছিল, কিন্তু অজস্র প্রতিবন্ধকতা সত্ত্বেও সমাজ ঝিনুককে জয়ী হতে দেয়নি।

পুরুষের না হয় 'রেপ' না হয়, 'মলেস্টেশন' এই শব্দগুলো শুধুমাত্র যেন নারীর সাথেই যায়। পুরুষের সাথে এইসব শব্দগুলো যায়ই না তাই পিতৃতন্ত্রের মধ্যে থেকে পুরুষরা মেয়েদের এই কষ্টটা বোঝার চেষ্টাই করে না। বরঞ্চ বলে এই সবকিছুই মেয়েদের দোষ নারীর সামাজিক মর্যাদা ক্ষুণ্ণ হয়, সামাজিক নির্মাণের কারণে। ছেলেদের কাছে নারী যেন একটা যৌন আধার। আবার অধিকারপ্রাপ্ত স্বামীও মাঝে মাঝে আদরের স্ত্রীকে সন্দেহ করতে দ্বিধা বোধ করে না। এখানে স্ত্রীর প্রতি কর্তব্যের পরিবর্তে দোষ দেওয়ার প্রবণতাই লক্ষণীয়। রমিতার কাছে এটাই সবচেয়ে কষ্টকর। বাইরের লোক কে কি বলে তা নিয়ে মোটেও চিন্তিত নয়, রমিতার কাছে সবচেয়ে দুঃখের তার স্বামীর আচরণ। স্বামীর আচরণের কথা চিন্তা করে রমিতা অত্যন্ত গুটিয়ে গিয়েছিল নিজের মধ্যে। এর পরেও পলাশ রমিতাকে যৌন উপভোগ করতে ছাড়ে না। এর মধ্যে দিয়ে পুরুষের আধিপত্যবাদী আগ্রাসী মনোভাবের পরিচয় পাওয়া যায়। যে অপমানের যন্ত্রণার রমিতা কাতর সে অপমানের মূল্য তার কাছের মানুষেরা কেউ-ই বুঝল না। অবশেষে, সেই অযাচিত ঘটনার দায় এসে বর্তায় নারীর ওপর। নারী যেন শুধুমাত্র সমস্ত দায়িত্ব পালনকারী একটি যন্ত্র তার না আছে মন না আছে চেতনা, শুধুমাত্র পুরুষের ভোগ্য। যুগ-ভাবনা চিন্তা সময় এগিয়ে গেলেও নারীর অবস্থান কিন্তু কিছুই বদলায়নি। পিতৃতান্ত্রিক সমাজ ব্যবস্থায় নারীর সামাজিক অবস্থার কোনো পরিবর্তন হয়নি। পিতৃতন্ত্রের শৃঙ্খলে বন্দী নারী আজও পুরুষের হাতের ক্রীড়নক মাত্র রয়ে গেছে।

নাগরিক আবহে আধুনিকতার সময়ে নারীসত্ত্বার নানা বিভঙ্গ এবং সংকটের তীব্র আর্তি ফুটে উঠেছে দহনের বয়ানে। যদিও পলাশের মুখে নারী পুরুষের সমান অধিকারের কথা শোনা যায়, আসলে তা কিন্তু নয়। রমিতা সেটা খুব ভালো করেই জানে। তবুও নারী তার আবেগকে সংবরণ করতে না পেরে পুরুষকে ভালোবেসে গেছে। সমস্ত অপমান অভিমান-যন্ত্রণা গোপন করে নারী পুরুষকে ভালোবেসেছে তার ঔপবিশিক কিংবা বিনিময় মানসিকতার ওপর

ভিত্তি করে।

মৃণালিনী চরিত্রটি এই উপন্যাসে সংসার অভিজ্ঞতারভারে প্রবীণ। ঝিনুক যখন রমিতা চৌধুরীর পাশে দাঁড়িয়ে পাশে দাঁড়িয়ে ঘরে বাইরে ক্ষতবিক্ষত তখন ঝিনুকের পাশে এসে দাঁড়িয়েছে তার ঠাকুমা মৃণালিনী তার কথায় অবশ্য ঔপন্যাসিক নারীচেতনাবাদের স্বরূপ তুলে ধরেছেন।

> ''আমাদের সময়ে তোদের সময়ে কতটা কি তফাৎ হয়েছে বুঝি না বাপু। হ্যাঁ। তোরা এখন অনেক বেশি স্বাধীন, মিলিটারিতে যাচ্ছিস। হিমালয়ে উঠছিস, ছেলেদের সঙ্গে পাল্লা দিয়ে লেখাপড়া শিখছিস চাকরি করছিস। তবু বুকে হাত দিয়ে বল তো, সত্যি কতটা ছাড় পেয়েছিস তোরা? এটা বুঝিস না, ছেলেরা যতটা ছাড়বে ঠিক ততটাই জমি পাবি তোরা? তার বেশি এক চুল নয়। ছেলেরা সংসারের ভেতরে আটকে থাকা জবুথবু মেয়ে আর পছন্দ করছিল না, তাই তাদের পড়াশোনা করতে দিয়েছে। ছেলেরা একা সংসার চালাতে পারছিল না কিংবা বলা যায়, সংসারের প্রয়োজন হল, তাই তোরা চাকরি করতে বেরোলি। বেশি দূর যেতে হবে না। তুই তোর মা মাসিদের দ্যাখ, তাদের ওপরে ঠাকুমা দিমিাদের দ্যাখ, তাহলেই বুঝতে পারবি কিভাবে একটু করে ছাড় দেওয়া হয়েছে তোদের। এখন ছেলেরা তোদের আরও খোলামেলা দেখতে চায়। তাই টিভিতে সিনেমায় বিজ্ঞাপনে তোদের খোলামেলা হয়ে নেচে বেড়াতে হচ্ছে। ছেলেদের মন খুশি রাখার জন্য। আর সেটাকেই তোরা স্বাধীনতা ভেবে ছাগলছানার মতো লাফাচ্ছিস। এটা স্বাধীনতা নয় রে দিদি, স্বাধীনতার মরীচিকা। স্বাধীনতা হল মনের অনুভূতি। তোদের সেই মনের স্বাধীনতাটাকে ছেলেরা কখনোই মানবে না। মানবেই বা কেন? আমরা সভ্য হলেও পৃথিবীতে এখনও আদ্যিকালের নিয়মটাই চলে। যার শক্তি বেশি তার কথাই আইন। জোরটাও তার।''[১০]

এই উপন্যাসের আখ্যান মূলত এটাই। এটাই হয়ত নারীবাদী আখ্যানের একটি ধারা প্রচলিত

নারীর আশ্রয়স্থল মাত্রই পুরুষ। শৈশবে পিতা, যৌবনে স্বামী আর বার্ধক্যে পুত্র। কিন্তু বর্তমান যুগের পরিপ্রেক্ষিতে সকলেই বিভিন্ন জায়গায় আছে। বাবা-মা কে আলাদা করে দেওয়ার মতো সময় থাকে না, দূরদর্শী মৃণালিনী তাই পুত্রের সংসারে থাকতে মোটেও ইচ্ছুক ছিল না। পুরোপুরি বা আক্ষরিক অর্থে স্বনির্ভর না হলেও মৃণালিনীর মানসিকতা ছিল স্বনির্ভর তিনি চাইতে বা না চাইতেই প্রমাণকার দিয়েছেন, বৃদ্ধাকালে নারীর আশ্রয় শুধুমাত্র করে পুত্র নয়। নারী নিজেই নিজের আশ্রয় হতে পারে এমনকী অন্যান্য অনেকেই সাহায্য করতেও পারে। তিনি শুধুমাত্র ব্যক্তি নয়, সমষ্টির কথা ভেবেছেন সংসারের ভারে অভিজ্ঞ হয়েও তিনি সময়োপযোগী নারীপরিসর নির্মাণে সমর্থ হয়েছেন। এক্ষেত্রে বলাবাহুল্য, নারীবাদী আখ্যানের ক্ষেত্রে 'দহন' এক অভিনব মাত্রা দান করেছে।

অমলেন্দু চক্রবর্তীর 'রাধিকাসুন্দরী' উপন্যাসটিও বাংলা আখ্যানে নারীবাদী ধারাকে বহন করে চলেছে। যদিও আখ্যানতত্ত্বে এটি কোনো নতুন ধরনের ধারা নয়, এ প্রসঙ্গে শরৎচন্দ্রের উল্লেখযোগ্য কয়েকটি উপন্যাস হল 'অরক্ষণীয়া', 'পল্লীসমাজ', 'বামুনের মেয়ে' ইত্যাদি অজস্র আছে। তবে অমলেন্দুবাবুর উপন্যাসের আখ্যানভাগে আরো কঠিন সমাজ বাস্তবতা ফুটে উঠেছে।

গ্রাম থেকে শহরে আসা একটি গরিব মেয়ে জীবনযুদ্ধে নিজেকে টিকিয়ে রাখার জন্য যে সংগ্রামে অবতীর্ণ হয়েছিল তার বিচিত্র রূপই রাধিকাসুন্দরী উপন্যাসে বাস্তবায়িত হয়েছে। আখ্যানের এই ভিন্ন মাত্রাকে অভিনবত্ব দান করেছেন ঔপন্যাসিক।

আখ্যানতত্ত্বের শুষ্ক তাত্ত্বিক ব্যাখ্যার পরিবর্তে নারীচেতনাবাদী প্রেক্ষিতে আখ্যানতত্ত্বের বিশ্লেষণ যেমন সরস তেমনি সমাজ উপযোগী। অমলেন্দু চক্রবর্তীর 'রাধিকাসুন্দরী' উপন্যাস তিনপর্বে বিন্যস্ত। সমাজে নারীর কঠিন অবস্থা ধরা পড়েছে এই উপন্যাসে। যেখানে নিম্ন প্রান্তিকায়িত রাধিকাসুন্দরী ও উচ্চবিত্ত, কিরণশশী সকলেই পিতৃতন্ত্রের আগ্রাসনের শিকার। কিন্তু উভয়েই সামাজিক অবস্থানগত দিক থেকে একেবারে ভিন্ন মাত্রার। অর্থাৎ জাতি-ধর্ম-বর্ণ নির্বিশেষে নারী মাত্রই পুরুষতন্ত্রের শিকার। নিজের অস্তিত্ব রক্ষার ক্ষেত্রে নারীর এ-এক

জীবনব্যাপী সংগ্রাম। পিতৃতান্ত্রিক পরিসরে থেকেও এদের বিরোধিতা করা যেন জলে থেকে কুমীরের সঙ্গে লড়াইর মতন। কিন্তু এখানেই মানুষের সঙ্গে তফাত প্রাণীর। কুমীর আর মানুষ কোনো ভাবেই তুলনীয় নয়, তবে পুরুষের আগ্রাসনের হাত থেকে মুক্তি পাওয়ার সহজতম উপায় হিসেবে উল্লেখ করা যায় যে সম্পর্কের মধ্যে থেকে সম্পর্কে উত্তরণের কথা। অর্থাৎ প্রত্যাশা জীবনকে বিষময় করে তোলে। সম্পর্কের কাছ থেকে কিছুই প্রত্যাশা করা উচিত নয়।

রাধিকাসুন্দরী আর্থিক স্বাধীনতার কারণে হুগলী জেলার প্রত্যন্ত গ্রাম থেকে শহরে এসেছে দুটো টাকার মুখ দেখার আশায়। আর্থিক স্বচ্ছলতার কারণে। একটু ভালো থাকার আশায়। রাধিকার দুঃসহ জীবন যন্ত্রণা থেকে মুক্তি পাওয়ার আপ্রাণ প্রয়াসই রাধিকাসুন্দরী।

> ''কবিতা ব্যক্তিক ও অনুভূতিপ্রবণ হলেও কথাসাহিত্য অথবা আখ্যান বস্তুবিশ্বকে ধারণ করেই রচিত হয়। ফলে শিল্পে রূপান্তরের পর তা যতই ভিন্ন বলে মনে হোক, বাস্তবকে এড়িয়ে অথবা অগ্রাহ্য করে তা রচনা সম্ভব নয়।''[১১]

তাই এই সময়ের আখ্যানে বারবার উঠে এসেছে বিপন্ন মানবী বিশ্বের কথা। বর্তমানে এই বিপন্ন মানবী বিশ্বের অস্তিত্বের খোঁজ করতে গিয়ে 'রাধিকাসুন্দরী' এক অন্যতম চরিত্র। নারীর এই অস্তিত্ব সংকট ও সেখান থেকে উদ্ধারের পথ খুঁজতে গিয়ে যে পরিসরে ঘোরাফেরা করা হয় তাতে অনেকটাই নারীচেতনাবাদের সৌরভ চলে আসে। অমলেন্দু চক্রবর্তীর 'রাধিকাসুন্দরী' নারীর বিপন্ন অস্তিত্বকে নিয়ে এক অসাধারণ উপন্যাস। শুধুমাত্র সাহিত্য নয়, বাস্তব কথা এই উপন্যাসে প্রধান হয়ে দাঁড়িয়েছে।

'যতসময়-পরিসর ঘটনা বৃত্তান্ত সম্পর্কিত অনুপুঙ্খগুলি আহরণ করি—সূত্রধর এবং/অথবা গ্রহীতা হিসাবে—সংযোগের প্রকরণ গুলি অনিবার্যভাবে আমাদের সংবেদনায় সম্পৃক্ত হয়ে যায়।''[১২] 'রাধিকাসুন্দরী' উপন্যাসটি পড়তে গেলে যে উপন্যাসের কথা সবথেকে বেশি মনে আসে তা হল 'অরক্ষণীয়া' 'পল্লীসমাজ', 'বামুনের মেয়ে' ব্যাপক একটা সময়ে পরিবর্তন ঘটে গেলেও নারীর অবস্থা কিন্তু তেমন কোনো পরিবর্তিত হয়নি। আখ্যান একই থেকে গেছে। কিন্তু আধারের পরিবর্তন না হলেও জিনিসের কিন্তু বহু পার্থক্য থেকে গেছে। নারীর সমস্যার

পরিবর্তন না ঘটলেও সমস্যা পটের পরিবর্তন ঘটে গেছে শরৎচন্দ্র থেকে অমলেন্দু চক্রবর্তীর রচনা এবং সাহিত্যপটে। 'রাধিকাসুন্দরী' উপন্যাসে সমাজে বিভিন্ন শ্রেণির নারীর পরিচয় থাকলেও সকলের অবস্থার ব্যাপক পরিবর্তন সাধিত হয়নি। কিরণশশী, সুমতিবালা, রাধিকা, পরি সকলেই নারীর প্রায় একই অবস্থা বহন করে চলেছে। জীবনতত্ত্ব ও আখ্যানতত্ত্বের এক মিলিত প্রয়াস দেখা গিয়েছিল 'রাধিকাসুন্দরী' উপন্যাসে। বাস্তবের সঙ্গে সাহিত্য মিলে মিশে একাকার হয়ে গেছে। 'রাধিকাসুন্দরী উপন্যাসে রাধিকা আর উপন্যাসের একটি চরিত্র নেই। সে বাস্তবের এক জীবন যুদ্ধের সৈনিক হিসাবে নিজের পরিচয় প্রতিষ্ঠা করেছে।

বিধাননগরে কিরণশশী ও নিশীথরঞ্জনের আকাশছোঁয়া ফ্ল্যাটে দাসীবৃত্তি করতে আসে রাধা, সুদুর বেলমুড়ি গ্রাম থেকে। নিজের একটা অস্তিত্ব প্রতিষ্ঠা আর্থিক স্বচ্ছল হওয়ার তাগিদে রাধা চলে আসে নতুন কলকাতার এক আজব দুনিয়ায়, এমনকিছু বেশি বয়সে রাধা দাসীবৃত্তি করতে আসেনি। ছোটো ছেলেমেয়েদের বয়সে যখন তার খেলাধুলো করার সময় তখনই চলে আসে সে দাসীবৃত্তি করতে। কিন্তু এই সব কিছুর পরও রাধার জীবন কাটে দুঃসহ যন্ত্রণার মধ্যে দিয়ে। জীবনে সে কখনো শান্তি পায় না। সারাজীবন তাকে মাশুল চুকিয়ে আসতে হয় মেয়ে হয়ে জন্মানোর। সারা জীবনে খুব কম মেয়েরাই নিজের ব্যক্তিস্বাতন্ত্র্য, নিজের ইচ্ছা-অনিচ্ছা, সবকিছুকে গুরুত্ব দিয়ে বাঁচতে পারে। বেশিরভাগ নারীর জীবনই কারাগারে রুদ্ধ কারুর সোনার খাঁচা তো কারুর টিনের তারের খাঁচা, খাঁচা বিভিন্ন উপাদানে তৈরি হলেও খাঁচা কিন্তু খাঁচাই থেকে যায়। খাঁচা থেকে মেয়েরা ততটাই বেরোতে পারে যতটা একটা পুরুষ চায় কোথায়ও তাদের স্বাধীন গতিবিধি নেই। রাধার জীবনের এই চরম সত্যের কথা তুলে ধরেছেন অমলেন্দু চক্রবর্তী তার নির্মম লেখনীতে।

হত দারিদ্র্য থেকে বাঁচতে রাধা আসে কাজের মেয়ে হয়ে। কিন্তু মেট্রোপলিটন সিটিতে এসে বেলমুড়ি গ্রামের রাধা বেশ অবাক-ই হয়। কিন্তু দয়ালু কিরণময়ী তাঁকে অত্যন্ত ভালোবাসে। সবকিছুই দেয়। প্রথম প্রথম রাধা এসে ম্যাক্সি পরত কিন্তু বেশ কিছুদিন পর থেকেই শুরু হয় শাড়ি পরা। কিরণময়ী রাধাকে বলেন, ''বড় হয়ে যাচ্ছিস তাই। আমার কাছে আছিস সে একরম। কিন্তু তোদের গ্রামে তো আসল মা আছে একজন। আত্মীয় কুটুমরা সবাই রয়েছে। বেশি বাড়

ভাল নয়। ওরা বলবে কী আমাকে?"[১৩] এখান থেকেই শুরু হয় সামাজিক নির্মাণ তুমি মেয়ে তারপর আবার গ্রামের মেয়ে পিতৃতন্ত্রের মধ্যে থেকে নারী তার স্বাধীন সত্তা নিয়ে বিকশিত হতে পারেনি। এভাবে কঠিন বাস্তবের শেড ধরা পড়েছে তার উপন্যাসে।

রাধাকে এভাবে ধীরে ধীরে বিভিন্ন দুঃখ, কষ্ট, অপমান, লাঞ্ছনাকে স্মৃতিকরে ফিরে আসতে হয় বেলমুড়ি গ্রামের দাঁড়গাছিতে। সেখানে এসে আবার আর এক ধরনের কষ্ট। দীর্ঘদিন ধরে শহরে থাকার সমস্ত সুযোগ সুবিধার এমনকী বেশ কিছু শহুরে কেতায় অভ্যস্থ হয়ে গিয়ে রাধার গ্রামে এসে বেশ অসুবিধে হতে শুরু করে। বিবাহযোগ্য মেয়েকে ফেলে রাখার সাহস গ্রামের বিধবা করবে না, তাই কোনো রকমের মেয়ে বিয়ে দিতে পারলেই সে দায়মুক্ত হতে পারে। পরিবারে কন্যা সন্তান তখনও বাবা মার বোঝা, তারপর আবার বাবা যদি না থাকে সে মেয়ের অবস্থা তো আরও করুণ। কারণ পিতৃতন্ত্রের মধ্যে থেকে কারুরই পিতৃতন্ত্রকে অস্বীকার করতে পারা সম্ভব নয়। কারণ পুরুষই গোটা সমাজ সংসারকে চালিত করছে তাই সামান্য পরিবারের কর্তা হিসাবে পুরুষ না থাকলে সেই পরিবারের মেয়েরা নষ্ট হিসাবে গণ্য হয়। সেই ভয় হয়তো সুমিতাবালার মধ্যে ছিল। তাই তাড়াতাড়ি সে মেয়েকে কোনো একটি পুরুষের হাতে তুলে দিতে চেয়ে ছিলেন, যার সামাজিক ছাড়পত্র ছিল বিবাহ কিন্তু শিক্ষিত, আর্থিক দিক থেকে স্বচ্ছল দয়ালু কিরণময়ী হয়তো তার বড়ো ছেলেকেও সঠিকভাবে শিক্ষিত করতে পারেননি। তাহলে রাধা ধর্ষিত হোত না। বাবন রাধাকে শুধুমাত্র ধর্ষণ করেই ক্ষান্ত থাকেননি। জোর করে তার হাতে পাঁচটা একশো টাকার নোট গুঁজে দেয়। তার কাছে রাধার শারীরিক বা মানসিক যন্ত্রণার কোনো মূল্যই নেই। নারীর শরীরের মূল্য নির্ধারিত হয়েছে অর্থনৈতিক ভিত্তিতে। অথচ কলকাতার সমস্ত সুযোগ সুবিধায় অভ্যস্থ রাধা তার মা সুমতিবালার কথায় বিবাহ করতে রাজী হয় না। কিন্তু কোনো উপায় না পেয়ে সে মস্তান শিবচন্দ্রের সাথে পালায় শিবচন্দ্রের সাথে রাধার নতুন জীবন শুরু হয় কলকাতার বস্তিতে, সেখানে অবশ্য সে মেট্রোপলিটনে থাকার আর বলাবাহুল্য বড় লোক বাড়িতে থাকার সমস্ত সুযোগ সুবিধা থেকে বঞ্চিত হয়। এভাবেই ধীরে ধীরে রাধার জীবনে নেমে আসে বিড়ম্বনা, লাঞ্ছনার কালো অন্ধকার। রাধার কাছে এ যেন এক নতুন কোলকাতা সম্পূর্ণ অন্যরকম জীবন। এখানে শিবচন্দ্রের সাথে রাধিকার জীবন

কলকাতার বস্তিতে ভয়ঙ্কর হয়ে ওঠে। শিবচন্দ্র রাধাকে ধর্ষণ করে। কিন্তু শুধুমাত্র বিনিময়ের কথা ভেবে রাধা চুপ করে থাকে। কারণ রাধা মনে করেন শিবচন্দ্র ই তার জীবনসঙ্গী, সে এটা করতেই পারে। নারী এখানে শুধুমাত্র যৌন ভোগ্য সামগ্রী হিসাবে নির্ধারিত হয়েছে।

বলাবাহুল্য এভাবে ভারতে তথা সারা বিশ্বে অজস্র নারীর ওপর স্বামীর যৌন নির্যাতনের ঘটনা ঘটে চলেছে। সেটা জোর করে শারীরিক সম্পর্ক করাই হোক বা স্ত্রীর ইচ্ছা থাকা সত্ত্বেও শারীরিক সম্পর্কে অনিচ্ছা সবকিছুই হতে পারে। মনু বলেছিলেন বিবাহ-ই নারীর একমাত্র গতি অর্থাৎ পুরুষের ইচ্ছায় নারীর জীবন নির্ধারিত হবে। যৌন নির্যাতন নারীর ওপর কখনোই নিপীড়ন বলে গ্রাহ্য করতে নারাজ পুরুষ। কারণ পিতৃতন্ত্রের ধ্বজা অক্ষুণ্ণ রাখতে পুরুষের যৌন আগ্রহকে বা অনাগ্রহ কে নারী প্রেক্ষিতে বিচার করলে পিতৃতন্ত্রের অপমান।

তপোধীর ভট্টাচার্যের ভাষায়, ''আঙ্গিকের সামঞ্জস্য ব্যাহত হয় দেখাদের নানা ধরনের কূটাভাস, তখন কোনো কোনো কথাকার যেন সময়ের দাবিতে এগিয়ে এসে অভ্যাসের জড়তা ভাঙার আয়োজন করেন। কথাশিল্প পর্ব পর্বান্তরের সূচনা হয়।''[১৪] কথা শিল্পের ভাঙা গড়ার মধ্যে দিয়েই জন্ম নেয় 'আখ্যান'। প্রত্যেকদিন প্রত্যেক মুহূর্ত পাল্টে যাচ্ছে সময়ের বহিঃপ্রকাশ তাই জীবন যাপনের প্রত্যেকটি বিন্দু-ই ক্রমশ পাল্টে যাচ্ছে। তৈরি হচ্ছে ভিন্ন ভিন্ন আখ্যান, রাধিকাসুন্দরীর প্রেক্ষিতে এভাবেই আখ্যান ভাবনায় সংযুক্ত হয়েছে অভিনব মাত্রা। সাধন চট্টোপাধ্যায়ের মন্তব্যে ব্যাপারটা বুঝিয়ে বলা যেতে পারে যে, যে কোনো আখ্যানের মূল দায়িত্ব হ'ল এক বা একাধিক স্পেস এ পাঠকদের চালিত করা। সময় সম্পর্ককেও একই কথা। সব আখ্যানই অতীতের কিন্তু পাঠকের কাছে তা বর্তমান হয়ে যায়।

রাধিকাসুন্দরীর বর্ণনা কথন বা গল্প ভীষণ বেশি সমসাময়িক, শিবচন্দ্রের সাথে থাকা নতুন জীবনে পরিই রাধিকার ত্রাতা, সহায়িকা, বন্ধু, এই উপন্যাসের মধ্যে কোনো সুখকর পরিণতি নেই। আছে বাস্তবের কঠোর নিষ্ঠুর রূঢ়তা। ঔপন্যাসিক পাঠককে শান্তি সখের পরিণতিতে পৌঁছতে দেননি। শিবচন্দ্রের সাথে কলকাতায় আসার পূর্বে রাধিকার জীবন ছিল একরম আর শিবচন্দ্রের সাথে আসার পর রাধিকার জীবন হয়ে যায় সম্পূর্ণ ভিন্ন। বাবন, মুনমুন, বুলবুলির প্রতি কিরণময়ী অত্যন্ত দুর্বল থাকলেও রাধাকে যে তিনি একদম সহ্য করতে পারতেন না

তেমন নয়। যদিও সন্তানের সাথে পরিচালিকার কোনো তুলনাই চলে না। তবুও কিরণময়ী রাধিকার প্রতি সহানুভূতিশীল ছিল। রাধাকে কিরণময়ীর তিন সন্তান ডাইনির অপযশ দিলেও কিরণময়ীর দ্বারা উদ্ধার হয় রাধা। এক্ষেত্রে বলাবাহুল্য, ''শিক্ষিতে অশিক্ষিতে সমবেদনা নাই। শিক্ষিত অশিক্ষিতের হৃদয় বোঝে না।''[১৫] এটা তো গেল অনেকটা সমাজতন্ত্রের কথা কিন্তু রাধার যেমন অস্তিত্ব সংকট দেখা দিয়েছিল। নিশীথরঞ্জনের ফেলে আসা অতীতকে কিন্তু ধনী কিরণময়ী ও অস্বীকার করতে পারে না। এখানে একেবারে আর্থিক সহায় সম্বলহীন রাধিকা ও কিরণময়ী কোথাও একই রেখায় মিশে যাচ্ছে। পুরুষতন্ত্র শিক্ষা, অশিক্ষা, ধনী, দরিদ্র, সব ক্ষেত্রেই তার করাল থাবা বসিয়েছে। ঔপনিবেশিক নারী তা অতিক্রম করতে পারেনি। হাজার অপমান, লাঞ্ছনা সত্ত্বেও নারী তার ব্যক্তিস্বাতন্ত্র্যের দিকে এগিয়ে গেলেও আত্মপ্রতিষ্ঠা করতে পারেনি। তাদের নিজস্ব জগৎই তৈরি হয়নি। এখানে রাধা বা কিরণময়ী কারুর-ই নিজের ভুবন গড়ে ওঠেনি।

আত্মপ্রতিষ্ঠার ক্ষেত্রে অনেকসময় জন্মদাত্রী ও বাধা হয়ে দাঁড়ায়। কারণ বাবা মা আমাদের জন্ম দেন ঠিকই। লালন পালন করেন, স্নেহ ভালোবাসা সবটুকু দেন। কিন্তু একটা সময়ের পর তাদের মধ্যেও জেগে ওঠে বিনিময়ের আশা। এটা খুব সহজ মনস্তত্ত্ব সে সন্তানের কাছে অকারণ সহানুভূতি আদায়ের চেষ্টা করে। যেন খারাপ টা দেখিয়ে পরিবর্তে ভালো কিছু পাওয়ার আশা করেন তারা, এটাই চিরন্তন চিরকাল ব্যাপী চলে আসছে। এটা হয়ত পিতা মাতা খুব সচেতনভাবেই করেন। একটা সময়ের পর মানুষ ভীষণ স্বার্থপর হয়ে পড়ে। রাধিকাসুন্দরীর ক্ষেত্রেও এর ব্যতিক্রম হয়নি। এর সমর্থনে রাধিকাসুন্দরী বলে ''মেয়ে ঘরে ফিরবে বলে মেয়েরই রোজগারে শুধু এইটুকুই করতে পেরেছে ঘাড় মটকানো বুড়ি''।[১৬] রাধার যেন দুঃখ করার জায়গাটিও নেই, আনন্দ প্রকাশের জায়গাটুকু ও নেই। আত্মপ্রতিষ্ঠার তাগিদে, একটু ভালো থাকার জন্য রাধার আপ্রাণ প্রয়াস, 'রাধিকাসুন্দরী' উপন্যাসের মূল বিষয়বস্তু এছাড়া তো তার জীবনে আছে অজস্র ঝড় ঝাপটা টানা পোড়েন, সব কিছুকে অতিক্রম করেই বোধহয় রাধিকার ভালো থাকার প্রয়াস তবুও শেষ রক্ষা হয় না, শরৎচন্দ্রের উপন্যাসের নায়িকার মতো রাধা নিজের ভাগ্যের প্রতি কখনো চোখের জল ফেলে না। সে আপন ভাগ্য জয় করার আপ্রাণ চেষ্টা চালিয়ে যায়। যে

কলকাতা পালায়। এদিকে বিধবা মা সুমতিবালাকে শুনতে হয়, সমস্ত গ্রামবাসীর অভিযোগ বলাবাহুল্য এটা যদি পুরুষসন্তান পালাতো তাহলে হয়ত তাকে এতো কথা শুনতে হোত না। পিতৃতন্ত্রের মধ্যেবাস করে পিতৃতন্ত্রের বিরোধিতা করা সম্ভব নয়। এটাই হয়ত সমগ্র পুরুষ জাতির সচতুর কৌশল। আর ঔপনিবেশিক ভাবনায় প্রক্ষালিত নারী জগতের প্রতিনিধি সুমতিবালা তখন নিজের মেয়েকেও নষ্ট মেয়ে বলতে ছাড়েনি। তার লড়াই হল কলকাতায় যাওয়া এখানেই দেখা যাচ্ছে আখ্যান ভাবনার বিবর্তন, ঐতিহ্যের পরিবর্তে আধুনিকতার ছোঁয়া স্পষ্ট। তবে ঐতিহ্য সহকারে নারী এখানেও নির্যাতিত হচ্ছে কী ভয়ঙ্করভাবে। তার বিবরণ শুনলে শিউরে উঠতে হয়।

শিবচন্দ্রের সাথে কলকাতায় চলে এলেই তার জীবনে শান্তি আসে না। আসলে শিবচন্দ্র জানে মেয়ে মানুষ মানেই ভোগের সামগ্রী তাই সে তার ইচ্ছামতো ভোগ করবে ভেবে কলকাতায় এসেছে। মেয়ে মানুষের ইচ্ছা শুনবে কেন? শিবচন্দ্রের কলকাতায়ে আসাটাও যেন বিনিময়ের মধ্যে সীমাবদ্ধ রাধার ইচ্ছা কলকাতার গিয়ে আত্মপ্রতিষ্ঠা আর শিবচন্দ্রের ইচ্ছা মেয়ে নিয়ে ফুর্তি করা। সুতরাং শিবচন্দ্র এর মধ্যে কোনো খারাপ দেখে না, লাখ টাকার কারবার ছেড়ে সে এসেছে শুধুমাত্র সুদে আসলে সে রাধাকে ভোগ করে নেবে। সে রাধাকে কলকাতায় এনেছে সুতরাং ভোগ করার ব্যাপারে সে একচুল ছাড়তেও নারাজ। রাধার ইচ্ছা অনিচ্ছার কোনো মূল্যই শিবচন্দ্র তাকে দেয়নি। শিবচন্দ্রের কাছে মেয়ে মানুষ খুবই সুস্বাদু এবং ভোগ্য। হাজার অনিচ্ছা সত্ত্বেও অচল অবস্থার চিৎ হয়ে শুয়ে থাকে।

> ‘‘হাত পুড়ছে পা পুড়ছে চোখ পুড়ছে মাথার চুল পুড়ছে বুক পুড়ছে পাছা পুড়ছে যোনি পুড়ছে জঙ্ঘা পুড়ছে যৌবন পুড়ছে বয়স পুড়ছে সাধ পুড়ছে—তার বেঁচে বরতে থাকার সবটুকুই ঝালমশলায় কুরে কুরে যাচ্ছে কেউ। পুড়ে পুড়ে খাক হয়ে যাচ্ছে সে। যেখানে যেখানে সে যতটুকু মেয়ে মানুষ জ্বলে পুড়ে মাংসপিণ্ডে দলা পাকিয়ে মরে যাচ্ছে না, লুট হয়ে যাচ্ছে।’ এই এলোপাথাড়ি ঝড়ের তাণ্ডবও ফুরোয় এক সময়। লুটপাটের লুটেরাও নিস্তেজ হয়ে আসে।’’[১৭]

অর্থাৎ নারী শরীরকে দলামোচড়া করতে করতে কর্তা ও একসময় ক্লান্ত হয়ে পড়ে তখন-ই শোষিতের হয়ত শারীরিক নিস্তার, কিন্তু মানসিক বিধ্বংসী লীলা চলতেই থাকে শোষিতের মস্তিষ্কে। রাধিকা বিবাহিত নয়, সে শিবচন্দ্রের সঙ্গে শারীরিক সম্পর্কেও খুব একটা ইচ্ছুক নয়, অথচ শুধুমাত্র বিনিময়ের কারণে রাধার হয়ত এই নীরব প্রতিবাদ। কিন্তু রাধার পাশে সহৃদয় হয়ে নারীচেতনাবাদী প্রতিনিধি রূপে আত্মপ্রকাশ করে পরি। রাধার উপর হওয়া অন্যায় অবিচারের জন্য সে রুখে দাঁড়ায়। কিন্তু অবশেষে উপন্যাসের শেষ সীমায় পৌঁছেও শিবচন্দ্রের এই উক্তিতে স্পষ্ট হয় যে নারী শুধু মাত্র ভোগ্য বস্তু।

রাধিকাসুন্দরী স্বনির্ভর ছিলেন। ছিলেন আত্মবিশ্বাসী। তার কাজ শুধুমাত্র মহিলা মহলে সীমাবদ্ধ নয়, তিনি একজন পুরুষের সাথে সমান তালে জীবনযুদ্ধে এগিয়ে চলেছিলেন, বস্তুত কর্মে ক্ষমতায়, মননে চিন্তনে নারীর পুরুষের মধ্যে যে দুস্তর ব্যবধান ছিল তা এখন অনেকটাই কমে এসেছে বললে ভালো হয়। তবুও বিভিন্ন আলোচনা সমালোচনা নির্মাণের ক্ষেত্রে লিঙ্গ বৈষম্যের ঔজ্জ্বল্য ম্লান হয়নি। আর এই লিঙ্গ বিভাজন-ই তৈরি করে নারীর প্রতি সমাজের তীব্র প্রতিবাদী কণ্ঠস্বর সিমোন দ্য বোভোয়ার 'দ্য সেকেন্ড সেক্স' গ্রন্থে হয়তো একারণেই নারীকে দ্বিতীয় লিঙ্গের মানুষ বলে চিহ্নিত করা হয়েছে। 'রাধিকাসুন্দরী' উপন্যাসে ঔপন্যাসিকের নারীর প্রতি সহানুভূতিশীলতার দৃষ্টিভঙ্গি প্রকাশিত হলেও, পুরুষের প্রতিও তীব্র বিদ্বেষ প্রকাশিত হয়েছে। যদিও রাধিকাসুন্দরী উপন্যাসের শেষে দেখা যায় লিঙ্গনির্মাণের কৃৎকৌশলে প্রতিবাদী নারীর কণ্ঠস্বর চাপা পড়ে যায়। কিন্তু এরপরেও পুরুষের প্রতি তীব্র বিষোদগার দেখা যায় পরির বক্তব্যের মধ্যে। সে পুরুষের জঘন্য শরীর সর্বস্ব পৌরুত্বের প্রতি তীব্র বিষ ঢেলে দিয়েছে। নারীবাদী প্রতিনিধি হিসাবে পরি রাধিকাসুন্দরী উপন্যাসে অন্যতম চরিত্র, ঔপন্যাসিক একজন পুরুষ হওয়া সত্ত্বেও তিনি নারীর প্রতি এত সহমর্মী দৃষ্টি রেখেছেন তা সত্যিই প্রশংসনীয় সেক্ষেত্রে বলাবাহুল্য সকল পুরুষ মাত্রই নারীবিদ্বেষী নন। তবে নারীচেতনাবাদের সূত্রপাত একজন পুরুষের হাত ধরে। এটার পরিবর্তে নারীদের সমস্যার সমাধানের জন্য নারীদের এগিয়ে আসতে হবে এক্ষেত্রে রাধিকার সমস্যা নিয়ে সর্বসমক্ষে লড়াই এ নামে পরি এই কাহিনি বা বর্ণনার মধ্যে একটা নির্দিষ্ট সময় স্থান কাল পাত্র আছে। তাকে বাদ দিলে উপন্যাস হয়তো উপন্যাস-ই হয়ে

উঠতো না। তবে এর মধ্যে আখ্যান বিহীনতা কতটা বর্তমান তাও বিচার্য। রাধিকাসুন্দরী উপন্যাসে তিনটি পর্বে ঔপন্যাসিক নারীর ভিন্ন সমস্যাপটের কথা তুলে ধরেছেন। স্থান কাল পাত্রের সাথে নারীর সমস্যা পট পরিবর্তিত হতে থাকে, তার অসাধারণ বিবরণ তুলে ধরেছেন 'রাধিকাসুন্দরী'র উপন্যাস। ঔপন্যাসিকের বিবরণ যতই নিষ্ঠুর হোক না কেন, তার দরদী চোখে ধরা পড়েছে সার্বিক সহযোগিতাপূর্ণ দাম্পত্য ও সামাজিক জীবনের আকাঙ্খা, 'রাধিকাসুন্দরী' উপন্যাসে স্থানে দ্বন্দ্ব একটা গুরুত্বপূর্ণ অংশ হয়ে উঠেছে। নাগরিক ও গ্রামীণ জীবনের তফাৎ এই উপন্যাসে উঠে এসেছে, রাধিকাসুন্দরী, পরি, প্রভৃতি প্রান্তিকায়িত মানুষ নিজেদের জীবন ও উপলব্ধি দয়ে সমস্যাগুলিকে বুঝতে চেয়েছে।

সুমতিবালা চরিত্রটি তেমন গুরুত্বপূর্ণ না হলে তিনি আসলে পুরানো সময়ের ছাঁচে চালা, তারপর আবার প্রান্তিকায়িত, শিক্ষার আলো তাদের কোনো অংশেই পৌঁছতে পারেনি। সুমতিবালা নিজস্ব Identity তৈরি করার পরিবর্তে Safety Sceurity নিয়ে অনেক বেশি ব্যস্ত পিতৃতান্ত্রিক সমাজে বসবাস করে পুরুষের বিরোধিতা করার সাহস সুমতিবালার ছিল না। তাই শহর থেকে ফেরা মেয়েকে বেশিদিন বাড়িতে রাখতে চায়নি সুমতিবালা। তিনি আসলে নারীকে বোধহয় নির্দিষ্ট একটি ছকে দেখতে চেয়েছিলেন। পুরুষ শাসিত সমাজ তার যুক্তি বুদ্ধি-র দ্বারা রাধার নিজস্ব বিচারের পথকে অবরুদ্ধ করে দিয়েছিলেন। নির্ঝঞ্ঝাট, নির্বিবাদী নারী চিরকাল-ই তা মেনে এসেছে। যখন ই প্রতিবাদ করতে গেছে তখনই তাকে অজস্র প্রতিবাদ , প্রতিবন্ধকের সম্মুখীন হতে হয়েছে, অভাবটা বেশিরভাগ ক্ষেত্রেই শিক্ষা, শুধু শিক্ষা বলা ভুল, স্বনির্ভর এবং আত্মসচেতনার অভাব। যেদিন থেকে নারী সমাজ পরিসরের এই সকল ত্রুটিকে অতিক্রম করতে পারবে সেদিন-ই হবে আসল নারীর চেতনা, তবে উপন্যাসের মূল বিষয় নারীকে চেতনায়িত করা। কিন্তু বয়ানের শেষে কোথাও আনন্দকর পরিসমাপ্তি নেই। আছে Tragic Ending তবে এই বয়ানের ক্ষেত্রে উল্লেখযোগ্য বিষয় নারীবাদী আখ্যান। আখ্যানের ভিন্ন ধারার ক্ষেত্রে নারীবাদী আখ্যান একটি অন্যতম, আখ্যান কি ও কেন তা নিয়ে ভিন্ন মতামত থাকলেও 'রাধিকাসুন্দরী' উপন্যাসের বয়ানে আখ্যান এক অভিনব মাত্রায় ধরা দিয়েছে, আখ্যানে যেমন উপন্যাসের মতো জটিলতার ঘনীভবন থাকে না। চরিত্রের গতীর দ্বন্দ্ব থাকে না কিন্তু

একটা অসাধারণ কথন যাকে থাকে আমরা আখ্যান বলতে পারি। তবে, 'রাধিকাসুন্দরী'-র বয়ানে উপন্যাস ভাবনাটা অনেকটাই বেশি বললে ভুল হবে না।

তবে, প্রাসঙ্গিকভাবে উল্লেখ্য, ''সময় ও পরিসরের বহুমাত্রিক টানাপোড়েনে তৈরি হয় কাহিনি। আবার একই কারণে ভেঙে যায় তার অবয়ব। মানুষ নিজের প্রাপ্তি ও অপ্রাপ্তি, সাধও সাধ্যের ব্যবধান নিয়ে উদ্বেল হয় কখনও কখনও বা বিষণ্ণ। আবার তার সত্তার পর্যটন পেরিয়ে যায় পরিচিত দ্বৈততা। কথকতার নতুন বিন্যাস দিয়ে কাহিনির ভেতর ও বাইরের অভ্যাসকে পাল্টে দেয় মানুষ। বিশ শতকের অন্তিম পর্যায়ে লেখার যত রূপান্তর ঘটেছে, সেই জন্যে দায়ী অনিকেত মানুষের পথ হারানো আর পথ খোঁজার দ্বিরালাপ নিবিড় পাঠ আর পুনঃপাঠ ছাড়া এখনকার বিচিত্র প্রতিবেদনগুলির মোকাবিলা করা অসম্ভব। অন্তত সেইসব পাঠকৃতির যাদের উৎস ভূমি অপ্রাতিষ্ঠানিক চেতনা। কাহিনির দিন শেষ কিনা আদি মধ্য অন্ত অবান্তর কিনা, এসব নিয়ে তর্ক করার চেয়ে সাম্প্রতিক বয়ানের গভীরে প্রবেশ করা অনেক ভালো। দেখা যাবে নিশ্চয়তা নেই কোথাও, নেই কোনো চূড়ান্ত বিন্দুও। উপন্যাস অভিধার চেয়ে আখ্যান অভিধা হিসেবে বেশি গ্রাহ্য কিনা, এই ভাবনায় মীমাংসা থাকুক বা না থাকুক—নিরবচ্ছিন্ন পাঠের মধ্যে দিয়ে সময়ও পরিসরের আন্তঃসম্পর্ক আর বিন্যাসক্রম যাচাই করে নেওয়া ছাড়া অন্য উপায় নেই কোনো,''।[১৮]

> 'Therefore narrative is a fundamental expression of the question of being as a moment of presence ... Narrative is both the process and the consequesnce of this temporal structuration'[১৯]

অর্থাৎ আখ্যান বলতে অস্তিত্বের কালানুক্রমিক দ্যোতনা। মানুষ তার স্মৃতি-সত্তা-ভবিষ্যতের ধারণাও আখ্যান কথকের মধ্য দিয়ে ভাষারূপ দিতে পারে। আখ্যানের উপস্থাপনা শুধুমাত্র বর্ণগ্রন্থিত হবে, এমন নয়, অন্য বিভিন্ন মাধ্যমে আখ্যান উপস্থাপন করা যাবে।

ঘটনা, এক বা একাধিক ঘটনার শাব্দিক উপস্থাপন এগুলির ক্রিয় হিসাবে কথন বা লিখন— এগুলি আখ্যানের মুখ্য চরিত্র বৈশিষ্ট হিসাবে পরিগণিত হয়। পরিভাষিক অর্থে এগুলিকে আমরা কাহিনি, পাঠকৃতি এবং কথন হিসাবে পরিচয় আগেই পেয়েছি। উপন্যাসের বিভিন্ন প্রকারের কথা আমরা আগেই উল্লেখ করেছি। একাধিক ধরনের উপন্যাসের মধ্যে একটি হল জীবনীমূলক উপন্যাস। বিশ শতকের নব্বই-এর দশকে একটি উল্লেখযোগ্য জীবনীমূলক উপন্যাস হল 'দেখি নাই ফিরে' (১৯৯২)। সমরেশ বসুর রচিত এই উপন্যাসটি বিখ্যাত ভাস্কর রামকিঙ্কর বেইজ-কে নিয়ে। সমরেশ বসুর জীবনের শেষ উপন্যাস 'দেখি নাই ফিরে'। জীবন সায়াহ্নে দাঁড়িয়ে লেখক বিশ শতকের একজন বিখ্যাত শিল্পীর জীবন নিয়ে উপন্যাস রচনা করেছেন। সবচেয়ে উল্লেখযোগ্য বিষয় হল উপন্যাস যখন শুরু হয় তখন শিল্পী রামকিঙ্কর বেইজ জীবিত। জীবিত কোনো শিল্পীকে নিয়ে উপন্যাস রচনা বাংলা সাহিত্যে নজিরবিহীন। আর এই নজিরবিহীন কাজটি সার্থকতার সঙ্গে শুরু করেছেন বিশ শতকের এক উল্লেখযোগ্যভাবে তিনি সাহিত্যিক সমরেশ বসু। উল্লেখযোগ্য এবং খুব সচেতনভাবেই সার্থকতার সঙ্গে শুরু করেছেন বলেছি, তার কারণ আছে। উপন্যাস শুরু করার পর রামকিঙ্কর ইহলোক ত্যাগ করেন। সবচেয়ে মজার ব্যাপার লেখকের হঠাৎ প্রয়াণে অসম্পূর্ণই থেকে যায় এই মহান কর্মকাণ্ডটি।

বহু বৈচিত্র্যে পরিপূর্ণ একজন ব্যক্তি রামকিঙ্কর বেইজ। বাঁকুড়া জেলার এক অখ্যাত গ্রামে, ততোধিক অখ্যাত পরিবারে জন্মগ্রহণ করেন। জীবনের প্রথম আঠারো বছর তিনি সেই গ্রাম-পরিবারেই কাটান, অল্প বয়স থেকেই তার মধ্যে শিল্পীভাব জাগ্রত হয়। স্বাধীন মনের মানুষ সমস্ত প্রতিকূলতা কাটিয়ে শিল্পী সত্তাকে মনে মনে বয়ে নিয়ে বেরিয়েছেন। প্রথাগত শিক্ষাকে বুড়ো আঙুল দেখিয়ে প্রতিভার পরিচর্যায় মনোনিবেশ করেছেন। রামকিঙ্কর নিজেই স্বীকার করেছেন— ''গ্রামের সাধারণ স্কুলে ঠেলাঠেলি করে ম্যাট্রিক পাশ পর্যন্ত হয়েছিল।''[২০]

এই রকম এক ব্যক্তি জীবনের জোয়ারে এসে হাজির হল রবীন্দ্রনাথের বিশ্বভারতী বিশ্ববিদ্যালয়ে। রবীন্দ্রনাথ তখন জীবিত। রামকিঙ্করের বয়স উনিশ বছর। উনিশ বছরের

একজন যুবক। একদিন রবির ডাকে সাড়া দিয়ে গেলেন দেখা করতে। পরণের পোশাক খাটো ধূতি, তবে তা কোঁচা দেওয়া, আর গেরুয়া পাঞ্জাবি। পোশাক পরিচ্ছদ থেকে আমরা ধারণা করতে পারি তিনি আর্থিক দিক থেকে পিছিয়ে পড়া সমাজের প্রতিনিধি। পিছিয়ে পড়া সমাজের প্রতিনিধি একটা গোটা উপন্যাসের কাহিনি হয়ে উঠেছে। আমরা জানি কাহিনি বলতে বোঝায় বাস্তবিক কালানুক্রমিক ঘটনাবলি এবং তাতে অংশগ্রহণকারী চরিত্র ও বিষয়। আলোচ্য উপন্যাসের প্রধান চরিত্র শিল্পী রামকিঙ্কর বেইজ, এবং তাঁর শিল্পী হয়ে ওঠার কাহিনি। এখানে আখ্যান কথক লেখক স্বয়ং। পাঠকৃতি পাঠ করার সময় পাঠক ভুল করে বসে কাহিনি ও কথকের মধ্যে। কথকের জীবন কথাই যেন প্রকাশিত হয়ে পড়ে। শরৎচন্দ্রের 'শ্রীকান্ত' উপন্যাস পাঠের ক্ষেত্রে এই ভ্রান্তি চোখে পড়ে জীবনীমূলক উপন্যাসে কোনো একজন ব্যক্তির জীবন কাহিনি লেখকের মনের রঙে রাঙিয়ে রূপদান করেন। জীবন কাহিনিই সেখানে মুখ্য রূপ লাভ করে। লেখক যেন নিজেকে সম্পৃক্ত করে উপন্যাসের চরিত্রের জীবনের সঙ্গে। আলোচ্য উপন্যাসের বিষয় হিসাবে চিহ্নিত হয়েছে শিল্পী রামকিঙ্কর বেইজ-এর অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ কয়েকটি বছর। মূলত একুশ থেকে পঁয়তাল্লিশ বছরের জীবন কাহিনি উপন্যাসে স্থান পেয়েছে। সাগরময় ঘোষ উপন্যাসের ভূমিকায় লিখেছেন যে তাঁর একদিকে শিল্পীসৃষ্টির সুকঠোর সাধনা এবং প্রচণ্ড বিরোধিতা। অন্যদিকে জীবনে নানা নারীর আনাগোনা, প্রেম, প্রতিরোধ, নিন্দে-মন্দ, অন্তঃক্ষরা সংগ্রাম। সংগ্রামই জীবন। সংগ্রামহীন জীবন, জীবন পদবাচ্য হয় না। বাঁকুড়ার এক অখ্যাত গ্রাম থেকে উঠে এসে অনেক প্রতিকূলতার মুখোমুখি হতে হয়েছে শিল্পীকে। তবে শুধু প্রতিকূলতাই নয় অনেক বিখ্যাত ব্যক্তিবর্গের সান্নিধ্য তাঁর শিল্পী জীবনকে মহিমাময় করে তুলেছে।

লেখক সমরেশ বসু অত্যন্ত যত্ন সহকারে তথ্য সংগ্রহ করে রচনায় হাত দিয়েছেন। প্রতিষ্ঠান বিরোধী মনোভাব তার ছোটবেলা থেকেই লক্ষ করা যায়। প্রথাগত শিক্ষার থেকে দূরে থেকেও তিনি সমাজের একজন হয়ে উঠতে পেরেছেন। পূর্বেই উল্লেখ করেছি তিনি কোনও রকমে ম্যাট্রিক পাশ করে চলে আসেন শান্তিনিকেতনে। তাঁর প্রতিভার প্রথম প্রকাশ সেখানেই ছড়িয়ে পড়ে। বিমূর্ত ধারণাকে রূপদান করতে গিয়ে তিনি একাধিক অবয়ব-এর

সাহায্য নিয়েছেন। আজও তার অবিস্মরণীয় কৃত্তিগুলি আমাদের চোখ এড়িয়ে যায় না। ব্যক্তিগত জীবনেও তিনি ছিলেন তথাকথিত 'ভদ্দরলোক' বিরোধী। এই বিরোধিতার প্রকাশ আরও প্রকট হয় যখন ডোমকন্যা রাধারাণীকে তার ঘরে তোলেন। বিয়ে না করেও তাকে সহধর্মিনীর সম্মান দেন। নিজে গৃহহীন থেকে রাধারাণীর জন্য বাড়ি বানিয়ে দেন। শিল্পী জীবনের অনেক কাহিনিই ধরেছেন লেখক। তার মধ্যে একটি উল্লেখযোগ্য কাহিনি উল্লেখ করা প্রয়োজন বলেই মনে হয়। 'দেশিকোত্তম' উপাধি প্রাপ্তির পর শিল্পী রামকিঙ্কর বেইজকে সংবর্ধনা দেওয়ার আয়োজন করে কলাভবনের ছাত্র-ছাত্রীরা। অনুষ্ঠানের পৌরোহিত্য করবেন স্বয়ং উপাচার্য। রামকিঙ্কর প্রস্তাব দেন, রাধারাণীকেও উপাচার্যের পাশের আসন সমমর্যাদায় আসন দিলে তবেই তিনি অনুষ্ঠানে যাবেন। ছাত্ররা অবাক হলেও প্রস্তাবে সায় দিতে বাধ্য হয়। লেখক দক্ষতার সঙ্গে শিল্পীর শিল্পী জীবন ও ব্যক্তিজীবনকে অসাধারণ দক্ষতায় উপন্যাসে স্থান দিয়েছেন। কিন্তু দুঃখের বিষয়, লেখক সম্পূর্ণ করে যেতে পারেননি তাঁর অতুলনীয় এই কীর্তিটি। লেখকের মৃত্যুর সঙ্গে সঙ্গেই উপন্যাসেরও 'অকাল সমাপ্তি' ঘটে। এ প্রসঙ্গে রামকিঙ্কর বেইজ-এর প্রিয়তম শিষ্য শঙ্খ চৌধুরী উক্তিটি স্মরণীয়— ''থাক না অসম্পূর্ণ 'দেখি নাই ফিরে', ভগ্নস্বাস্থ্য নিয়ে সমরেশের সেই প্রাণপাত্র সবেদন দানে দেশ ঋণী থাক।''[২১]

সমরেশ বসুর শ্রেষ্ঠ কীর্তিগুলির মধ্যে একটি অন্যতম হল 'দেখি নাই ফিরে'। মোট তিনটি অধ্যায়ে বিভাজিত উপন্যাসের প্রথম দুটি সম্পূর্ণ করার পর সবচেয়ে উল্লেখযোগ্য তৃতীয় অধ্যায় শুরু করার পরিকল্পনা ছিল লেখকের। শিল্পীর সবচেয়ে উল্লেখযোগ্য সময় একুশ থেকে চল্লিশ বছরের জীবন-যৌবন। কিন্তু তা আর সম্পূর্ণ হয় নাই। লেখকের অসামান্য কীর্তি অসম্পূর্ণই থেকে যায়। কিন্তু যতটুকু পেয়েছি তাই বা কম কিসের!

লেখক পাঠকৃতি তৈরি করেন। তাঁর নিজস্ব ধরনের বহিঃপ্রকাশ। পাঠকৃতি তৈরি হয় একটি নির্দিষ্ট সময়ে। অর্থাৎ যাকে আমরা 'পাঠকৃতির সময়' বলে চিহ্নিত করতে পারি। পাঠকৃতিতে এক বা একাধিক কাহিনি থাকে। সেই কাহিনি বা কাহিনিগুলি ঘটার একটি নিজস্ব সময় আছে। এটাকে 'কাহিনি সময়' হিসাবে চিহ্নিত করতে পারি। আবার পাঠক যখন পাঠকৃতি

পাঠ করেন তারও একটা সময় আছে। এই সময়গুলিকে উত্তীর্ণ হয়ে যাওয়াই পাঠকৃতির সার্থকতা। আলোচ্য 'দেখি নাই ফিরে' উপন্যাসের কাহিনি সময় বিশ শতকের প্রথম দশক থেকে পঞ্চম দশক পর্যন্ত। কাহিনি রচিত হয়েছে রামকিঙ্কর বেইজ-এর জীবন নিয়ে। অর্থাৎ রামকিঙ্কর বেইজ-এর জীবন কাহিনিই পাঠকৃতির কাহিনি। লেখক যে সময়ে দাঁড়িয়ে পাঠকৃতি নির্মাণ করেন তাই পাঠকৃতির সময়। সমরেশ বসুর 'দেখি নাই ফিরে' রচনা করেন বিশ শতকের আশির দশকে। লেখকের মৃত্যুর পূর্বে এটিই তাঁর শেষ নির্মাণ। আর পাঠক নানা সময়ে পাঠ করতে পারেন। পাঠকৃতির নির্মাণের শেষ থেকে পাঠকের সময় শুরু হয়। এই সময় নির্দিষ্ট কোনও সীমানা দিয়ে বাঁধা যায় না। বর্তমান সময়ে দাঁড়িয়ে পাঠকৃতি কতটা সময়কে উত্তীর্ণ করতে পারল তার উপরই পাঠকৃতির সার্থকতা নির্ভর করে। আলোচ্য উপন্যাসটি বর্তমান সময়ে অবশ্যই প্রাসঙ্গিক বলেই মনে হয়। যদি তা না হত তাহলে বর্তমান সময়ে তা আলোচনার বিষয় হয়ে উঠত না।

বিশ শতকের নব্বই-এর দশকে নির্বাচিত বাংলা উপন্যাসে আখ্যান-এর বিবর্তন এর আলোচনায় কয়েকটি উপন্যাসকে নির্বাচিত করে আলোচনা করা হয়েছে। নব্বই-এর দশক একটি শতকের সমাপ্তি দশক। পুরো একটি শতকের অভিজ্ঞতায় পুষ্ট এই দশক। উপন্যাস বাংলা সাহিত্যের সবথেকে নবীনতম একটি সাহিত্য প্রকরণ। বাংলা উপন্যাসের সূচনা বছর যদি ধরে নিই বঙ্কিমচন্দ্রের 'দুর্গেশনন্দিনী' থেকে তাহলে বলতে পারি আলোচ্য সময়ের প্রায় দেড়শ বছর পূর্বে উপন্যাসের সূচনা। প্রথমে ঐতিহাসিক কাহিনি নির্ভর, পরে সামাজিক রাজনৈতিক ইত্যাদি একাধিক বিষয় নিয়ে উপন্যাস রচনা হয়েছে উপন্যাস বলতেই আমাদের মনে যা আসে তা হল একটি বহু পাতা বেষ্টিত বয়ান। সেখানে বহু চরিত্রের ভিড় থাকবে, একটি মূল কাহিনি থাকবে, সেই মূল কাহিনি কে কেন্দ্র করে একাধিক উপকাহিনি থাকবে, কাহিনিগুলি কার্যকারণসূত্রে যুক্ত থাকবে এবং চরিত্রগুলির মধ্যে দ্বন্দ্ব থাকবে। এছাড়াও আরো একাধিক বৈশিষ্ট্য আছে। কিন্তু উপন্যাসের মূল বিষয় একটি নিটোল কাহিনি। তার নিবৃত্তি ঘটনার জন্য চরিত্রের বা ভূমিকার প্রয়োজন। উনিশের দশকে উপন্যাসগুলিতে তারই প্রকাশ লক্ষ্য করি। ইংরেজি Novel এর অনুসরণ করেই উপন্যাসের সৃষ্টি। তাই Novel এর বৈশিষ্ট্য

উপন্যাসও বহন করে চলেছে।

সময় সমাজ পরিবেশ ইতিহাস ইত্যাদি সব কিছুই উপন্যাসের মধ্যে প্রতিফলিত হয়। একটি সময়কে আলোকিত করতে লেখক একটি অন্য সময়ে বসে উপন্যাস লেখেন। স্বাধীনতা লাভের বহু বছর পর দেশভাগের ইতিহাস নিয়ে অনেক বয়ান রচিত হয়েছে। এ তো ইতিহাসের বিষয়। ঐতিহাসিকেরাও অতীতের ঘটনাকে তথ্যসমৃদ্ধ করে যুক্তি যুক্ত ভাবে লিপিবদ্ধ করেন। তাহলে সাহিত্যে ইতিহাসের স্থান কোথায়? ঐতিহাসিকরা যা দেখেন, যা তথ্য হাতে পান তার উপরই ইতিহাস লেখেন। কিন্তু সাহিত্যিকরা তা করেন না। ঐতিহাসিকরা যা দেখতে পান না, যা বলতে পারেননি তাই সাহিত্যিক তাঁর বয়ানে লিপিবদ্ধ করেন। যা হয়েছে তার থেকেও যা হওয়া সম্ভব বা যা যা হতে পারত তারই দিকে নির্দেশ করেন। বাস্তবের সঙ্গে কল্পনার একটা মেলবন্ধন সাহিত্যের বড় অস্ত্র। কল্পনা ছাড়া সাহিত্য রচনা করা প্রায় অসম্ভব। যা দেখছি তাকে অপরিচিত করে প্রকাশ করা এবং পাঠককে নতুন করে ভাবিয়ে তোলাই সাহিত্য কারের কাজ। ইতিহাস পাঠে আমরা তথ্য সমৃদ্ধ হই কিন্তু সাহিত্যপাঠে আমাদের ভাবনা, কল্পনার জগৎ বিস্তারিত হয়। লেখক আমাদের নতুন করে ভাবতে শেখান। অনেক জানা জিনিস ও আমরা নতুন করে ভাবতে বসি। সাহিত্যিকের বিচরণ তাই ভাবনার জগতে। আমরা জানি উপন্যাস সমাজের প্রতিচ্ছবি। সমাজে ঘটে যাওয়া ঘটনার পুনঃকথনই উপন্যাস। উপন্যাস একটি প্রকরণ, সাহিত্যের বিভিন্ন প্রকরণের মধ্যে এটিও একটি। বিবরণ প্রধান এই ধারায় গদ্যের রীতি প্রচলিত। কারণ পদ্যে বিবরণের জায়গা কম তাই গদ্য ছাড়া এই প্রকরণটি নিরুপায়।

বিশ শতকের সাহিত্য আলোচনায় পাশ্চাত্য সাহিত্য তত্ত্ব Narratology র হাত ধরে বাংলা সাহিত্যে আখ্যানতত্ত্ব নামে একটি স্বতন্ত্র সমলোচনা তত্ত্বের আবির্ভাব হয়। আখ্যান মূলক রচনা বাংলা সাহিত্যে নতুন নয়। প্রাচীন বাংলা সাহিত্যে আখ্যান কাব্যের ধারা বহুল প্রচলিত ছিল। আমাদের দুটি মহাকাব্যও আখ্যানকাব্য ধারারই অন্তর্গত। আমাদের দেশ ও দেশের মানুষ প্রায় দুশো বছর একটি বিদেশি শক্তির অধীনে পরাধীন ছিল। তাই তাদের শিক্ষা, রুচি, সংস্কার আমাদের আলোচনার বিষয় উপন্যাসের আখ্যান বিচার। অর্থাৎ নির্বাচিত উপন্যাসটি

কতটা আখ্যান সমৃদ্ধ হয়েছে বা কতটা আখ্যান সমৃদ্ধ হয়ে উঠতে পারেনি তারই আলোচনা এই আলোচনার বিষয়।

আখ্যান সম্পর্কিত আলোচনাই আখ্যানতত্ত্ব। আখ্যান বিভিন্ন মাধ্যমে পরিবেশরা করা যেতে পারে। মাধ্যম নিরপেক্ষভাবে আখ্যানের আলোচনাই আখ্যানতত্ত্বের বিষয়। বিশ শতকেই একটি স্বতন্ত্র ধারা হিসাবে আখ্যানতত্ত্ব পরিচিতি পায়। আখ্যান কোনো ঘটনার পুনঃকথন। কিন্তু ঘটনাটি কালানুক্রমিকভাবে আখ্যানে উপস্থিত হয় না। কালানুক্রমিক ঘটনাকে আমরা কাহিনি বা Story হিসাবে উল্লেখ করতে পারি। আখ্যানে কাহিনি বিষয়, ভাব অনুযায়ী সাজানো হয় একে আমরা প্লট হিসেবে চিহ্নিত করতে পারি। অ্যারিস্টটল তাঁর কাব্যতত্ত্বে প্লট সম্পর্কে আলোচনা করেছেন এবং এটিকেই উপন্যাসের মূল বলে অনেকে চিহ্নিত করতে চেয়েছেন। উপন্যাসের মূল উপজীব্য মানুষ। মানুষের জীবন, সমাজ পরিবেশ ইত্যাদি একাধিক বিষয় বিভিন্ন অবয়বে বেরিয়ে আসে বয়ানের মাধ্যমে। আখ্যান লিখিত মাধ্যমের মধ্যে উল্লেখযোগ্য হল Text বা পাঠকৃতি। লিখিত আকারে শব্দ বাক্য ইত্যাদি সমাহারে কোন লেখক পাঠকৃতি নির্মাণ করেন। পাঠক তাই পাঠ করেন। এই পাঠের মাধ্যমে লেখক ও পাঠকের মধ্যে সংযোগ স্থাপন হয়। লেখক যা বলতে চান তাই ভাষার সাহায্য পাঠকৃতিতে প্রকাশ পায়। আখ্যান উপস্থাপন করার জন্য একজন বা একাধিক কথক এর প্রয়োজন হয়। এই কথক লেখক সৃষ্টি কোন চরিত্র হতে পারে আবার বাইরের থেকে কোন ব্যক্তি কথন প্রক্রিয়া সম্পূর্ণ করতে পারেন। কথন বা Narration হল আখ্যানের একটি গুরুত্বপূর্ণ অংশ। কথক এর ক্রিয়া রূপই হল কথন। কথকের ধারণা আদিযুগের আখ্যান কাব্যগুলির ক্ষেত্রেও ছিল। কথক ঠাকুর আখ্যান কাব্যগুলি পাঠকরতেন এবং তার বিস্তারিত বিবরণ শ্রোতামণ্ডলীকে শোনাতেন। বর্তমান কালে আর আখ্যান কাব্যও নেই আর সেই শ্রোতাও নেই তবে কথক-এর ধারণা পাশ্চাত্য সাহিত্যতত্ত্বের রয়ে গেছে। বর্তমান আখ্যানতত্ত্বে কথক একটি গুরুত্বপূর্ণ অংশ জুড়ে আছে।

বিশ শতকের শেষ দুই দশকের উপন্যাসের আলোচনায় আখ্যানতত্ত্বের সাহায্য গ্রহণ করেছি। নব্বই-এর দশকে বাংলা সাহিত্যের একটি উল্লেখযোগ্য আত্মজীবনীমূলক উপন্যাস

প্রকাশিত হয় যার নাম 'দেখি নাই ফিরে' লেখক সমরেশ বসু তাঁর এটিই শেষ কীর্তি। জীবনের শেষ পর্যায়ে এসে লেখক এক ব্যক্তি মানুষের জীবন আলেখ্য রচনা করেছেন। তিনি রামকিঙ্কর বেইজ তিনিও শিল্পী। মূলত ভাস্কর্য এবং ছবি আঁকার কাজেও নিয়োজিত ছিলেন। উপন্যাসের বিষয় বাস্তব এবং জীবিত। রামকিঙ্কর বেইজ সম্পর্কে আমরা প্রায় সকলেই অল্প বিস্তর জানি। যখন উপন্যাস রচনা শুরু হয় তখন রামকিঙ্কর বেইজ ও জীবিত। এই রকম ঘটনা বাংলা সাহিত্যে বিবল। পূর্বে শরৎচন্দ্র চট্টোপাধ্যায় মহাশয় শ্রীকান্ত উপন্যাস লিখে আত্মজীবনী মূলক উপন্যাস রচনার একটা ভাব তৈরি করেছিলেন। সেখানে লেখকের নিজের কথাই প্রচ্ছন্ন ভাবে শ্রীকান্ত নামক কথক চরিত্রটির মুখে বসিয়ে একটা ছায়াময় পরিবেশ তৈরি করেছেন। শ্রীকান্ত কে আত্মজীবনী মূলক উপন্যাস বলতেও পারি আবার অস্বীকারও করতে পারি। কিন্তু সমরেশ বসু বিশ শতকের শেষের দিকে এবং নিজের জীবন সায়ান্যে জীবনীমূলক উপন্যাস লিখেছেন। উপন্যাসের উপজীব্য ব্যক্তি বা মানুষ। এখানেও একটি ব্যক্তি বা মানুষের কথাই বলা হয়েছে। রামকিঙ্কর বেইজ-এর জীবনের কিছুটা এখানে প্রতিফলিত হয়েছে তবে তা কতটা উপন্যাস বা আখ্যান হয়ে উঠতে পেরেছে তা আমাদের দেখনোর চেষ্টা করবো।

পশ্চিমবঙ্গে একটি প্রত্যন্ত জেলা বাঁকুড়ার আরো প্রত্যন্ত একটি গ্রামে জন্ম গ্রহণ করেন রামকিঙ্কর বেইজ। আমাদের সমাজের জাতিভেদের স্বীকার তিনি। তিনি নাপিতের সন্তান। পাড়ার মুখুজ্যেরা ব্যঙ্গ করে ডাকত 'লাপতের বেটা' বলে। সমাজ মুরুব্বিরা তুই সম্বোধনও করত, যা ব্যক্তি মানুষের অপমান। সমরেশ বসু দীর্ঘ দিন ধরে তথ্যসংগ্রহ করে তথ্য সমৃদ্ধ করে গড়ে তুলেছেন এই বয়ানটি। তথ্যের ভিড়ে এটি কতটা উপন্যাস হয়েছে বা কতটা জীবনী তারও বিশ্লেষণ দরকার। আত্মজীবনী বলতে বোঝায় নিজের জীবনী নিজের মুখে বলা। আত্মকথা বলার রীতি আত্মজীবনী। ইংরেজিতে যাকে আমরা Autobiography বলি। জীবনী বলতে বোঝায় দুজন ব্যক্তি একজন ব্যক্তির জীবন অন্যজন বর্ণনা করেন বা বিবরণ দেন। সমরেশ বসুর রামকিঙ্কর বেইজ-এর জীবন নিয়ে জীবনী রচনা করেছেন না উপন্যাস রচনা করেছেন তা পাঠকের উপর ছেড়ে দেওয়া ভাল। তবে সম্পূর্ণ করার পূর্বেই ব্যক্তি এবং লেখক উভয়েরই

মৃত্যু হয়। তাই সম্পূর্ণ কাহিনি আমরা পই না। প্রথম দুটি খণ্ডের পর লেখকের মৃত্যু হয়।

আমাদের পরিচিত ছকের বাইরে বেরিয়ে লেখক জীবিত মানুষের জীবন নিয়ে উপন্যাস রচনায় হাত দিয়েছেন। তাই প্রথম আমাদের মেনে নিতে কষ্ট হয়। উপন্যাসই বলছি কারণ পূর্বেও এটি উপন্যাস হিসাবেই আলোচিত হয়েছে। দ্বিতীয়ত লেখক তথ্য সংগ্রহ করে ইতিহাস লেখেননি। লেখকের মনের ভাবনাও তার তথ্যের সঙ্গে মিলে মিশে একাকার হয়ে গেছে। এটি পাঠ করতে করতে শুধু রামকিঙ্কর বেইজ কে পাঠক মনে করেন না লেখককেও যেন ভাবতে বসেন। অলক্ষে যেন লেখকই তার কথা রামকিঙ্কর এর সঙ্গে মিশিয়ে পাঠকের সামনে নিজের ভাবনাকে প্রকাশ করেছেন। নতুন ফর্মের সাহায্য নিয়েছেন লেখক, প্রকাশ পেয়েছে। যদি আমরা 'দেখি নাই ফিরে' উপন্যাসটিকে শুধু একজন ব্যক্তির জীবনী হিসেবে পাঠ করি তার এক রকম ভাবনা আবার যদি তৎকালীন সময় সমাজ, ইতিহাসকে বোঝার চেষ্টা করি তাহলে অন্য ভাবনা অন্য পরিসর। আবার একজন শিল্পীর জীবনের দুঃখ, বেদনা, যন্ত্রণা, বঞ্চনার কথা ভাবি তাহলে অন্য ভাবনা বেরিয়ে আসে। কিন্তু উপন্যাসের সাধারণ ধারণা নিয়ে আমরা পাঠ করতে বসি। উপন্যাস পাঠ করছি এই ভাবনা আগে থেকেই আমাদের মনে ভিড় করে তখন উপন্যাসের খুঁটিনাটি বৈশিষ্ট্য খুঁজে বেড়াই। সেখান থেকে বিচ্যুত হলেই আমরা বলতে থাকি ঠিক উপন্যাস হয় নি। বস্তুত উপন্যাসের এরকম কোন বাঁধা ধড়া ছকে বাঁধা যায় কি তার প্রশ্ন ও আমাদের মনে জাগে।

বাঁকুড়ার এক অখ্যাত গ্রামের নাপিত বংশের সন্তারা রামকিঙ্কর বেইজ। বাঁকুড়ার গ্রাম থেকে এসে পৌঁছান শান্তিনিকেতনে রবীন্দ্রনাথের আলয়ে। সেখানকার প্রভাবশালী গোষ্ঠির কাছে ঈর্শার পাত্র রামকিঙ্কর। পদে পদে লাঞ্চনা বঞ্চনা, এর একটা কারণ সে জাতিতে নাপিত। এটা যে শুধু শান্তি নিকেতনে এসেই ঘটল এমনটা নয় তার পাড়াতেও উচ্চবর্ণের লোকেরা তাকে নাপিতের বেটা নামে ব্যঙ্গ করত। অর্থাৎ জীবনের শুরু থেকেই তিনি শ্রেণি বৈশম্যের শিকার। উচ্চ শ্রেণির লোকেরা ক্ষৌরকর্মবিত্তির একজন মানুষকে তাদের অধিকৃত শিল্পের জগতে ঠিক মেনে তিে পারেননি। তবে তাঁর কঠিন ব্রতের কাছে সমস্ত কিছুই তুচ্ছ হয়ে গেছে। শিল্পের

প্রতি তাঁর আনুগত্য, ভালবাসা, সাধনা তাকে প্রবল বিরোধিতা সত্ত্বেও প্রতিষ্ঠা দিয়েছে। নাম গোত্রহীন একজন শিল্পী এসে হাজির হলেন শান্তিনিকেতনের মতো বোদ্ধাদের জায়গায়। তার কোন গুরু নেই। কোন পরিচয় নেই, সমাজে উচ্চ স্থান নেই। আকাশ, গাছ, নদী অর্থাৎ বলতে পারি প্রকৃতিই তার গুরু এরকম একজন ব্যক্তি চিত্রকলার পীঠস্থানে এসে নিজেকে মানিয়ে নিতে পারবেন না এও তো খুব স্বাভাবিক। ব্যক্তি মানুষ হিসেবে তিনিও সমাজ পরিবেশে আবদ্ধ তবে প্রতিষ্ঠান বিরোধিতার কথা আমরা আগেই জেনেছি। তিনি প্রাতিষ্ঠানিক শিক্ষায় শিক্ষিত ও হন নি। শিল্পের তাগিদে ঘুরে ঘুরে বেড়ান। কিন্তু শেষপর্যন্ত প্রতিষ্ঠানের কাছে এসেই বদ্ধ হয়ে পড়েন।

জীবনের শেষ সময়ে এসে লেখক হঠাৎ করে একজন শিল্পীর জীবন নিয়ে উপন্যাস রচনায় মনোনিবেশ করলেন কেন সে বিষয়ে আমাদের ভাববার অবকাশ আছে। শুধু কি রামকিঙ্করের জীবন নিয়ে কিছু কথা বলার জন্যই এত বড় প্রয়াস। এটা ঠিক বিশ্বাসযোগ্য মনে হয় না। তাহলে তো অন্য রূপও ছিল। তিনি জীবনী লিখতে পারতেন, উপন্যাসের সাহায্য নেওয়ার কোন প্রয়োজনই পড়ত না। উপন্যাস যখন লিখেছেন নিশ্চয় অন্য কোন উদ্দেশ্য ছিল। লেখকের জীবন অভিজ্ঞতার অনেক কথাই হয়ত ঠিক সরাসরি বলতে পারছিলেন না। তাই এরকম একটি মানুষ খুঁজছিলেন যার সাহায্যে অনেক না বলা কথা বলে দেওয়া যাবে। উপন্যাসের আকারে কিছু না বলা কথাই বলে নেওয়ার একটা প্রক্রিয়া। একজন লেখক যখন লেখা শুরু করেন তখন যা জীবন অভিজ্ঞতা থাকে, জীবন সায়াহ্নে তার বহুগুণ সঞ্চিত হয়। সেই ভাবনার প্রকাশ করার জন্য লেখক কয়েকটি উপকরণের সাহায্য নেন। সেই রকমভাবেই সমরেশ বসু জীবনীর ছলে একটি ব্যক্তি উপন্যাস লিখে নিজের অন্তরের কথাকে প্রকাশ করতেই চেয়েছেন।

মানুষের জীবন একমুখীন। সামনের দিকে এগিয়ে চলাই জীবন। জীবনে চলার পথে থমকে দাঁড়িয়ে পিছনের ভাবনা ভাবতে থাকে। তখন নানা দ্বন্দ্ব মনের মধ্যে কাজ করে। দুটি স্বত্ত্বাও একই সঙ্গে ক্রিয়াশীল থাকে জীবনে। একটি বহিঃস্বত্ত্বা। মানুষকে আমরা যতটা দেখি সেটা অর্ধেক। শুধুমাত্র বহিঃপ্রকাশটুকুই আমাদের চর্মচক্ষুর গোচরে আসে। কিন্তু তার আঁতের কথা আমরা সরাসরি বুঝতে পারি না। সাহিত্য সম্পূর্ণ মানুষ আঁকতে চান। তার অতরের কথাকে

কল্পনার সাহায্যে বাইরে বের করে আনেন। অন্তর এবং বাহির দুই মিলন সাহিত্যের একটা অন্যতম সাধারণভাবে যা আমরা দেখতে পাই না, তাই সাহিত্যে দেখতে পাই। উপন্যাস যেহেতু বিবরণ মূলক, বর্ণনা মূলক সাহিত্য প্রকরণ সেখানে মনের কথা খুলে বলার অনেক পরিসর থাকে। লেখক তাঁর ভাবনাকে কোন একটি বা একাধিক কাহিনির সাহায্য নিয়ে উপন্যাসের আকারে আমাদের সামনে উপস্থিত করেন। পাঠক তার ভাবনাকে নতুনভাবে গ্রহণ করতে পারে। আবার অনেকে পাঠক শুধু রস আস্বাদন করেই ক্ষ্যন্ত থাকেন। জটিল আলোচনা বা বিশ্লেষণে তারা নিয়োজিত হন না।

'দেখি নাই ফিরে' উপন্যাসে লেখক সমরেশ বসু রামকিঙ্করের জীবনীর সাহায্যে নিয়ে নিজের মনের কথা প্রকাশ করতেই চেয়েছেন। বাস্তব ব্যক্তি হিসেবে না দেখে শুধুমাত্র চরিত্র হিসাবে রামকিঙ্করকে কল্পনা করলে আলোচনা অনেক সহজ হবে। সমাজের প্রতি প্রতিবাদ স্বরূপ রামকিঙ্কর ডোমকন্যা রাধারাণীকে সহধর্মীনী করেছেন। বিবাহ ব্যতীত সহধর্মীনী সমাজ স্বীকৃতি দেয় না। সমাজের তোয়াক্কা না করেই তিনি তাই করেছেন। নিজের শিল্পী সত্তার গুণে নিজেকে প্রতিষ্ঠিত করেছেন সমাজের উচ্চ আসনে। তথাকথিত ভদ্দরলোকেরা হয়তবা ঘৃণার চোখে দেখেছেন কিন্তু তাতে তার কিছু আসে যায় না। সামাজিক প্রতিষ্ঠা দানের ও ব্যবস্থা করেছেন একজন ডোম কন্যাকে। স্বাধীনতার প্রায় পঞ্চাশ বছর পরও সমাজের ছবিটা তেমন কিছু বদলায়নি। শ্রেণি বিভাজন জাত সমস্যা আজও আমাদের সমস্যার সম্মুখীন করে বলেই বিশ শতকের শেষ দশকে দাঁড়িয়েও এই রকম একটি বিষয় উপন্যাসে প্রকাশ পায়।

কাহিনি হল বিমূর্ত বিষয়। সেই বিমূর্ত বিষয়কে মূর্ত রূপ দেওয়া হয় পাঠকৃতিতে। পাঠক বিমূর্ত বিষয়ের রূপ প্রত্যক্ষ করতে পারেন পাঠকৃতি পাঠ করে। আখ্যানের একটি বিমূর্ত বিষয় হল আখ্যানত্ব। অর্থাৎ যে বৈশিষ্ট্য গুণে আখ্যান, আখ্যান হয়ে ওঠে। দুটি নীতির কথা আমরা উল্লেখ করতে পারি। প্রথম হল, পাঠকৃতির তুলনায় কাহিনি প্রাধান্য লাভ করে। সেই কারণে কাহিনি পরিণামেই বয়ানের অর্থ নির্মিত হয়। অপর একটি হল, পাঠকৃতি কাহিনির তুলনায় মুখ্য ভূমিকা গ্রহণ করে। এক্ষেত্রে পাঠকৃতির অর্থেই কাহিনি নির্মিত হয়। আমাদের আলোচ্য 'দেখি নাই ফিরে' উপন্যাসে দুটির কোন টিই সেভাবে প্রাধান্য পায়নি। আমরা তথ্যের একটি

ভাণ্ডার পেয়েছি। রামকিঙ্কর নামক শিল্পীর জীবন ইতিহাস, সমাজ জানতে পেরেছি কিন্তু কাহিনি বা পাঠকৃতি কোনোটিই সেভাবে প্রাধান্য লাভ করেনি। উপন্যাস পাঠের শেষে আমাদের মনে সেভাবে কোন ভাবের উদয় হয় না। একটা সম্পূর্ণ জীবন কেমন ছিল তারই পরিচয় পাই। পাঠকের কষ্টকল্পনার কোন পরিসর লেখক সৃষ্টি করতে পারেননি। জীবনকে অপরিচিত করে, আমাদের জানা চেনার বাইরে প্রতিষ্ঠা করতে পারেননি, এখানে লেখক ব্যর্থ হয়েছেন বলতেই পারি।

'তত্ত্ব' আলোচনার বিষয়, সমলোচনার বিষয়। কোন রকম সৃষ্টির ক্ষেত্রে তত্ত্ব কোন ভাবেই প্রভাব বিস্তার করে না। কোন লেখক তত্ত্ব পাঠ করে লিখতেও বসেন না। একজন সৃষ্টিশীল মানুষ তাঁর কল্পনার আলোকে একটা কিছু নির্মাণ করেন। পরবর্তীকালে আলোচক সমালোচক বা পাঠক তত্ত্বের আলোকে পাঠ করে তার বিশ্লেষণ করেন। তাই সব উপন্যাসেই তার একটা নিজস্ব বৈশিষ্ট্য থাকে। সমরেশ বসু জীবন সায়াহ্নে এসে রামকিঙ্কর বেইজ-কে নিয়ে একটি দীর্ঘ বয়ান রচনা করেছেন। সেখানে তার জীবনের বিভিন্ন অংশের তথ্যসমৃদ্ধ বর্ণনা দিয়েছেন। কোথাও কোথাও আবার লেখকের মনের ভাবও প্রকাশ করে ফেলেছেন। চরিত্রের যন্ত্রণার সঙ্গে লেখকের যন্ত্রণাও মিশে গেছে। সমাজ পরিসর কে লেখক নিপুণ ভাবে সঙ্গে লিপিবদ্ধ করেছেন। বাঁকুড়া ও বীরভূমের গ্রামসমাজ, সেখানকার প্রাকৃতিক দৃশ্য, বিভিন্ন বর্গের মানুষ এবং তাদের মুখের কথাকে উপন্যাসে নিপুণ ভাবে নির্মাণ করেছেন। বহুপূর্বের বাঁকুড়ার গ্রামকে নির্মাণ করেছেন লেখকের কল্পনায়। তবে দুঃখের বিষয় লেখক তাঁর এই মহান কীর্তিটিকে শেষ করে যেতে পারেননি।

উপন্যাসে সময় একটি গুরুত্বপূর্ণ বিষয়। সময়কে অস্বীকার করে কোন ঔপন্যাসিক উপন্যাস রচনা করতে পারেন না। প্রায় সব উপন্যাসেই সময় থাকেই। তবে এটা নজরে রাখতে হবে সময় কতটা প্রাসঙ্গিক, আবার কতটা সময় উত্তীর্ণ। কারণ ঘটে যাওয়া ঘটনার পুনঃবিবরণ দিলেই তো উপন্যাস হয় না। উপন্যাসের আকারে যেমন বিস্তৃত তার বিশালতাও ব্যাপক। আখ্যানের আলোচনায় আমরা সময়ের কথা জেনেছি। একটি হল কাহিনি সময়। অর্থাৎ ঘটনা যে সময়ে ঘটে এটিকে বিমূর্ত বিষয় হিসেবে চিহ্নিত করা হয়েছে। কারণ পাঠকৃতিতে যখন

সেই কাহিনি উপস্থিত হয় তখন তা আর পাঠকের কাছে আসে না। দ্বিতীয় হল পাঠকৃতির সময়। বিমূর্ত কাহিনিকে রূপ দেবার জন্য লেখক ভাষার সাহায্য নিয়ে একটি বয়ান নির্মাণ করেন। তারও একটি নির্দিষ্ট সময় আছে। লেখক কোন সময়ে দাঁড়িয়ে তার পাঠকৃতি নির্মাণ করেছেন তারও সময় আছে। এটিই মূর্ত সময়। পাঠক পাঠকৃতিই পাঠ করেন। অর্থাৎ কাহিনির মূর্ত রূপ পাঠকৃতি বা Text এর মাধ্যমেই পাঠকের কাছে পৌঁছায়। পাঠকৃতি অনুযায়ী পাঠকের ভাবনা অনুরণিত হয়। অর্থাৎ পাঠকৃতির সময় সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ আরও একটি সময়ের কথা আমরা বলতে পারি তা হল পাঠক সময়। পাঠক কোন সময়ে দাঁড়িয়ে পাঠকৃতি পাঠ করছেন তারও প্রভাব পড়ে পাঠক মনে। মানুষ পাঠকৃতি পাঠ করে, মানুষের জীবন বা ব্যক্তি জীবন সম্পর্কে। এক ব্যক্তি অন্য ব্যক্তির জীবন থেকে অভিজ্ঞতা অর্জন করে, তার সঙ্গে লেখকের জীবন অভিজ্ঞতা ও পাঠকের মনে প্রভাব বিস্তার করে। সমরেশ বসু বিশ শতকের প্রথমার্ধের একটি বিষয়কে বিষয় হিসাবে গ্রহণ করেছেন 'দেখি নাই ফিরে' উপন্যাস-এ। ব্যক্তি হিসাবে রামকিঙ্কর বেইজকে নির্বাচন করেছেন। তাঁর জীবন সমাজ, সময় কে ভাষা দিয়ে নির্মাণ করেছেন। তবে যেহেতু ব্যক্তি নির্দিষ্ট জীবনের কথাই বলতে চেয়েছেন তাই পাঠক মনে তেমনভাবে প্রভাব ফেলতে পারেননি, লেখক বিশ শতকের দ্বিতীয়ার্ধে একজন শিল্পীর জীবনকে চিত্রায়িত করেছেন। পাঠক Text হিসেবে পেয়েছে বিশ শতকের শেষ দশকে অর্থাৎ সম্পূর্ণ বিশ শতক জুড়ে আছে উপন্যাসের সময়। কিন্তু উপন্যাসের মধ্যে আমরা তেমনভাবে সময়কে খুঁজে পাই না। ব্যক্তি রামকিঙ্কর-এর জীবনের কথা জানতে পারি ঠিকই কিন্তু উপন্যাস তো শুধু ব্যক্তির কথাই বলে না। ব্যক্তি ব্যতিরেকে অন্য বিষয়গুলি তেমনভাবে 'দেখি নাই ফিরে' বয়ানে আমাদের কাছে স্পষ্ট হয় না। আখ্যান তত্ত্বের প্রেক্ষিতে আলোচনায় আলোচ্য উপন্যাসটি গল্পের বা জীবনীর বয়ানই হয়ে উঠেছে আখ্যান সমৃদ্ধ উপন্যাস হয়ে উঠেছে কি না সে বিষয়ে সন্দেহের অবকাশ রয়েই গেছে। প্রাবন্ধিক দেবেশ রায় তাঁর 'উপন্যাসের নতুন ধরনের খোঁজে' বইয়েতে লিখেছেন,

> ''কিন্তু যা সম্ভাবনা ছিল, আকাঙ্খা ছিল, অভিপ্রেত ছিল, যুক্তিযুক্ত ছিল—তার কথা মনে না রাখলে সর্বনাশ ও সময়নাশের কাহিনি ও মানবসত্য হয়ে

ওঠে না। সেই আকাঙ্খা আর সম্ভাবনা অভিপ্রেত আর সঙ্গত উপন্যাসে সব সময়ই মনে পড়ে, উপন্যাস সব সময়ই মনে পড়িয়ে দেয়। তা যদি মনে না পড়ায় তাহলে উপন্যাসের কাহিনি তো হয়ে দাঁড়ায় আলগা গল্প। ঔপন্যাসিক মানুষের এই দুই সত্যের সংযোগস্থলের চড়াই ভাঙেন-যুক্তির সত্য আর সর্বনাশের সত্য। সেই কারণেই একজন ঔপন্যাসিক উপন্যাস রচনাকর্মী হিসেবেই সব সময় তাদের সহযাত্রী, যাঁরা তাঁদের নিজ নিজ ক্ষেত্রে মানবসংসারে যুক্তি আর কাণ্ডজ্ঞানের খোঁজে ফেরেন। কাণ্ডজ্ঞানই সবচেয়ে দুর্লভ চরম সঙ্কটে সে কথাই বারবার জানতে হয়।"[২২]

সমরেশ বসুর 'দেখি নাই ফিরে' একটি অসমাপ্ত উপন্যাস, রচনা চলাকালীনই তাঁর মৃত্যু হয়। তা সত্ত্বেও এটিকে আমরা উপন্যাস হিসেবেই পাঠ করে থাকি। তবে কতটা উপন্যাস হয়ে উঠতে পেরেছে তার আলোচনায় নরেন্দ্রনাথ দাসগুপ্তের একটি সমলোচনাকে আমরা উল্লেখ করতে পারি,

''নানা বৈপরীত্য, নিজের শিল্পীসত্ত্বাকে আর্থিক ও নানা চাপের মধ্যেই অবদমিত করে রাখতে বাধ্য হওয়ার ফলে যন্ত্রণা, অতৃপ্তি, অস্থিরতা এসবের মধ্য দিয়ে সমরেশ বসু তাঁর ছোট গল্পের জগৎকে তথা তাঁর সত্ত্বার শেষতকে খুঁজে পাবার দুর্মর অভীপ্সায়, 'দেখি নাই ফিরে' র নামের রামকিঙ্করের জীবন ও শিল্প কর্মের চিত্রটি এদেশের মানবিক ভবিষ্যৎ জীবনের এক আশ্চর্য ভাষা নির্মাণ অগ্রসর হয়েছিলেন উপন্যাসের ব্যপ্তিতে। ... দেখি নাই ফিরে'র আগে সমরেশ তার নিজস্ব শিল্পধর্ম অনুযায়ী যথার্থ উপন্যাস রচনায় সফল হননি, বিটি রোডের ধারে, গঙ্গা, টানাপোড়েন ইত্যাদি আসলে গড়া জগদ্দল বা যুগ যুগ জিওর মতো বিপুলায়তন উপন্যাসের শিল্পে জীবনের মত করে তুলতে পারেন নি। আসলে বিষয় বস্তুর সঙ্গে নিজের সত্ত্বার আত্মীয়তাবোধ ছাড়া সমরেশের শিল্পকর্ম পরিপূর্ণতায় প্রতিষ্ঠিত হতে পারে না। ... নিম্নবর্গের নারী পুরুষ চরিত্রগুলির সঙ্গে তাঁর সংলাপ চলতে থাকে, এই সংযোগ তথা

উপন্যাসের শিল্প মাধ্যমে আত্ম অন্বেষণের প্রয়াস আত্মোপলব্ধির লক্ষ্যবিদ্ধ হবার পরিপূর্ণ সুযোগ পেয়েছিল বলেই 'দেখি নাই ফিরে'র সমকালীন বয়োজ্যেষ্ঠ শিল্পী রামকিঙ্করের জীবন ও শিল্পের চিত্রণ অনন্য মৌলিকতায় দীপ্ত।... ব্রাত্য এই শিল্পী (রামকিঙ্কং) ছাড়া মহৎ সাহিত্য রচনার সম্ভাবনা তিনি দেখতে পাননি।"[২৩]

অর্থাৎ তাঁর রচিত পূর্বের উপন্যাসগুলিতে তিনি নিজেকে ঠিকভাবে খুঁজে পাননি তাই জীবনের শেষ পর্যায়ে এসে অন্য এক শিল্পীর জীবনকে আঁকড়ে নিজের খোঁজেই যেন বেরিয়েছেন। শুধুমাত্র নিজেকে খোঁজার তাগিদেই এই নির্মাণ। তাই এটি জীবনী বা গল্প হয়েছে ঠিকই কিন্তু যথার্থ উপন্যাস হয়ে ওঠার ক্ষেত্রে অন্তরায় হয়ে পড়েছে।

সমরেশ বসুর 'দেখি নাই ফিরে' আমরা উপন্যাস হিসেবে পাঠ করে থাকি। তবে উপন্যাসের থেকেও এটি বড় বেশি জীবন কথা হয়ে পড়েছে। রামকিঙ্কর বেইজ একজন প্রতিষ্ঠিত শিল্পী। সমরেশ বসুও একজন কথাশিল্পী হিসেবেই আমাদের কাছে প্রতিষ্ঠিত। পূর্বেই আমরা তাঁর বিটি রোডের ধারে, গঙ্গা ইত্যাদি উপন্যাস পেয়েছি। শেষে জীবনে এসে একজন শিল্পীকে নিয়ে অন্য আর একজন শিল্পী রচনা করছে উপন্যাস। সেখানে শুধু জীবন থাকবে না এটাই খুব স্বাভাবিক জীবনের সঙ্গে জড়িত অন্য জীব, সমাজ, পরিবেশ সবই একটির সঙ্গে আর একটি জুড়ে যায় খুব স্বাভাবিক নিয়মে। কিন্তু সমরেশ বসু তাঁর নিজের জীবনের না পাওয়া বঞ্চনা, ব্রাত্য জীবনকে তুলে আনতে গিয়ে কিছু ত্রুটি বিচ্যুতি ঘটে গেছে। রামকিঙ্করের জীবনে তাঁর বউদি বসন্তবালার ভূমিকা অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ। বউদিকে কেন্দ্র করে জীবনের অনেক ওঠা-পড়া এ সব তাঁর জীবনকে অন্য খাতে বইয়েছে। কিন্তু সমরেসবাবু তাঁর 'দেখি নাই ফিরে' উপন্যাসে সেই বউদি চরিত্রটিকে সেভাবে অঙ্কন করতে পারেননি। আমরা বলতেই পারি সমরেশবাবু রামকিঙ্করের বউদিকে ব্রাত্য করেই রেখেছেন যা রামকিঙ্করের চরিত্রটিকে ঠিক ঠিকভাবে আঁকার ক্ষেত্রে একটু বিঘ্ন ঘটেছে বলতেই পারি।

রামকিঙ্করের জীবনের ১৯ থেকে ৪৫ বছর পর্যন্ত বয়স নিয়ে উপন্যাস রচনায় হাত দিয়েছেন লেখক। প্রথম অংশে রামকিঙ্করের গ্রামের জীবন, বাঁকুড়ার একটি গ্রামে তাঁর বেড়ে ওঠা।

প্রকৃতির থেকে শিক্ষা গ্রহণ। কোনও গুরু ছাড়াই প্রকৃতির কাছেই তাঁর শিক্ষা, এটাও একটা ব্যতিক্রমই বলতে পারি। গ্রামের মধ্যে বর্ণ বিভাজনের শিকার। উচ্চ বর্ণের মানুষেরা তাঁকে এবং তাঁর শিল্পী সত্ত্বাকে অপমান করেছে, অবজ্ঞার চোখে দেখেছে। ব্যঙ্গ বিদ্রূপ করতেও ছাড়েনি তৎকালীন সমাজপতিরা। সমাজ বঞ্চিত একজন ব্যক্তি তাঁর শিল্পী সত্ত্বাকে আঁকড়ে ধরে কিছু শুভ মানুষের সান্দিধ্যে চলে আসেন শান্তিনিকেতনে রবীন্দ্রনাথের আশ্রয়ে। তাঁর সাহচর্যে তিনি যেন প্রাণ ফিরে পেয়েছেন। নন্দলাল বসুর সাহচর্য তাঁকে আরও সমৃদ্ধ করেছে। তবে সেখানেও খুব সহজ, সরলরেখায় জীবন এগিয়েছে তা নয়। সেখানে পৌঁছেও শ্রেণি বিভাজনের শিকার হয়েছেন। সেখানকার তথাকথিত শিক্ষিতজনেরাও এই শ্রেণিবিভাজন বয়ে বেড়িয়েছেন। তবে রামকিঙ্কর এই বিভাজনের গণ্ডিতে আটকে থাকেননি। তিনি সাঁওতাল রমণীকে বিবাহ না করেও সহধর্মিনীর মর্যাদা দিয়েছেন, তাকে প্রতিষ্ঠানিক মর্যাদাও দিয়েছে। তাতে সমাজপতিদের ক্রোধের আগুন আরও প্রজ্জ্বলিত হয়েছে। কিন্তু শিল্পীকে বা শিল্পকে দমিয়ে রাখতে পারেননি। সমরেশ বসু যেন এই পেয়েছেন রামকিঙ্করের মধ্যে। জীবনের শেষে নিজেকে খুঁজতেই যেন রচনায় হাত দিয়েছেন। রামকিঙ্কর সমাজপতিদের বিরুদ্ধে বিদ্রোহ ঘোষণা করেছেন। তাঁর শিল্পকর্মের মধ্য দিয়েই। এই সাঁওতাল রমণীর ভাস্কর্য তিনি নির্মাণ করেছেন যা নিঃশব্দ প্রতিবাদ বলা যেতেই পারে। জয়া আপ্পাস্বামী রামকিঙ্কর সম্পর্কে লিখতে গিয়ে লিখেছেন,

> ‘‘রামকিঙ্কর ভারতের প্রথম আধুনিক ভাস্কর। রামকিঙ্কর শান্তিনিকেতনে সত্যিকারের আধুনিক ভাস্কর্য মূর্তি গড়ে তুলেছিলেন। শিল্পী রামকিঙ্কর বিষয় ও উপলব্ধি অনুযায়ী ‘ফর্ম’-এর সন্ধান করেছেন সারাজীবন। খেটে খাওয়া মানুষ নিয়ে ছবি ও মূর্তি নির্মাণ করেছেন সারাজীবন। সাঁওতালদের নিয়ে এত কাজ আর কোনো ভারতীয় শিল্পী করেননি।’’[২৪]

সমাজের নিম্নবর্গের এবং নিম্নবিত্তের মানুষদেরকে শিল্পের বিষয় করে প্রতিষ্ঠানের চারিদিকে ভরিয়ে দেওয়া শিল্পী হিসেবে রামকিঙ্কর জীবনের বেশিরভাগ অংশই কাটিয়েছেন, সমরেশ বসু এই রকম একজন ব্যক্তিকে নির্বাচন করে তার জীবনের সঙ্গে নিজের জীবন মিশিয়ে উপন্যাস-এর কর্ম দেওয়ার চেষ্টা করেছেন। তবে কতটা উপন্যাস হয়েছে সে বিষয়ে সন্দেহ আছে। আখ্যান

শুধুমাত্র উপন্যাসেই থাকবে এমন কোনো বাধ্যবাধকতা নেই। আখ্যান একটি মাধ্যম নিরপেক্ষ বিষয়। তাই সমরেশ বসুর 'দেখি নাই ফিরে' সেই অর্থে উপন্যাস হয়ে উঠতে না পারলেও জীবনী আখ্যান হিসেবে আমরা পড়তেই পারি। কারণ উপন্যাসেও তো মানুষের জীবনেরই বর্ণনা বা বিবরণ দেওয়া হয়। তাই সেক্ষেত্রে জীবনী আখ্যান হিসেবে পড়তে অসুবিধা থাকার কথা নয়।

গতে বাঁধা উপন্যাসের ছক ভেঙে সমরেশ বসু একজন জীবিত শিল্পীর জীবন নিয়ে উপন্যাস রচনায় হাত দিয়েছেন। তবে দুঃখের বিষয় তিনি শেষ করে যেতে পারেননি। রচনা চলাকালীন রামকিঙ্কর বেইজ-এর মৃত্যু হয় তাঁর অনতিকাল পরেই লেখকও পরলোক গমন করেন। তবে বিশ শতকের শেষে দিকে আমরা একটি নতুন ফর্মের উপন্যাস উপহার হিসেবে পেয়েছি। আমাদের প্রাপ্তি তাতেই বা কম কিসের।

তথ্যসূত্র

১। প্রদীপণ দাশগুপ্ত ঙ্ম 'মানবী চেতনার বিশ্বায়ন ও অন্যান্য প্রসঙ্গ ' অমৃতলোক কলকাতা ২০০৫, পৃঃ-৩০।

২। সম্রাট দত্ত ঙ্ম 'বিশশতকের আখ্যানতত্ত্বের প্রেক্ষিতে বাংলা উপন্যাস' বঙ্গীয় সাহিত্য সংসদ কলকাতা ২০১০, পৃঃ-৪৫।

৩। সুচিত্রা ভট্টাচার্য ঙ্ম 'দহন' আনন্দ পাবলিশার্স কলকাতা ২০০৪, পৃঃ-৮৮।

৪। বেলা দাস ও বিশ্বতোষ চৌধুরী ঙ্ম 'বাংলা আখ্যান বহুমাত্রিক পাঠ' রত্নাবলী ২০১১, পৃঃ-৩।

৫। সম্রাট দত্ত ঙ্ম 'বিশশতকের আখ্যানতত্ত্বের প্রেক্ষিতে বাংলা উপন্যাস' বঙ্গীয় সাহিত্য সংসদ কলকাতা ২০১০, পৃঃ-১৮।

৬। দেবেশ রায় ঙ্ম 'উপন্যাসের নতুন ধরনের খোঁজে' দে'জ পাবলিশিং ২০০৬, পৃঃ-১৩।

৭। ঐ, পৃঃ-৩৩।

৮। সুচিত্রা ভট্টাচার্য ঙ্ম 'দহন' আনন্দ পাবলিশার্স কলকাতা ২০০৪, পৃঃ-৫২।

৯। ঐ, পৃঃ-৪৯।

১০। ঐ, পৃঃ-১৬৬-৬৭।

১১। বেলা দাস ও বিশ্বতোষ চৌধুরী ঙ্ম 'বাংলা আখ্যান বহুমাত্রিক পাঠ' রত্নাবলী ২০১১, পৃঃ-২৫।

১২। ঐ, পৃঃ-৪।

১৩। অমলেন্দু চক্রবর্তী ঙ্ম 'রাধিকাসুন্দরী' (১) দে'জ পাবলিশিং ১৯৮৬, পৃঃ-৪৫।

১৪। তপোধীর ভট্টাচার্য ঙ্ম 'আখ্যানের সাতকাহণ' অমৃতলোক সাহিত্য পরিষদ মেদিনীপুর ২০০৫।

১৫। অমলেন্দু চক্রবর্তী ঙ্ম 'রাধিকাসুন্দরী' (১) দে'জ পাবলিশিং ১৯৮৬, পৃঃ-২৮৬।

১৬। ঐ, (২), পৃঃ- ১০।

১৭। ঐ, (২), পৃঃ- ৩৯৪।

১৮। তপোধীর ভট্টাচার্য ঙ্ম 'আখ্যানের সাতকাহণ' অমৃতলোক সাহিত্য পরিষদ মেদিনীপুর ২০০৫।

১৯। সম্রাট দত্ত ঞ্ম 'বিশশতকের আখ্যানতত্ত্বের প্রেক্ষিতে বাংলা উপন্যাস' বঙ্গীয় সাহিত্য সংসদ কলকাতা ২০১০, পৃঃ-৪৯।

২০। অরুণকুমার মুখোপাধ্যায় ঞ্ম 'বাংলা উপন্যাসের রূপ ও রীতির পালাবদল', দে'জ পাবলিশিং, কলকাতা, ২০১১, পৃঃ-২৬৮।

২১। ঐ, পৃঃ-২৬৫।

২২। দেবেশ রায় ঞ্ম 'উপন্যাসের নতুন ধরনের খোঁজে', দে'জ পাবলিশিং, ২০০৬, পৃঃ-১৪।

২৩। অরুণকুমার মুখোপাধ্যায় ঞ্ম 'বাংলা উপন্যাসের রূপ ও রীতির পালাবদল', দে'জ পাবলিশিং, কলকাতা, ২০১১, পৃঃ-২৮২।

২৪। ঐ, পৃঃ-২৮৪।